ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

যাকোবের পত্রের উপর লিখিত টীকাপুস্তক

Commentary on the Letter of James

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

যাকোবের পত্রের উপর লিখিত
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB | International Bible CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letter of James

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

ভূমিকা

এই পত্রের লেখক সিবদিয়ের পুত্র যাকোব নন; কারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া যিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্টিয় ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগেই তাঁকে হেরোদ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, প্রেরিত ১২ অধ্যায়। বরং এই পত্রটি লেখক হলেন আলফেয়ের পুত্র যাকোব, যিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞাতি ভাই, বারোজন শিষ্য বা প্রেরিতের মধ্যে একজন, মথি ১০:৩। তাঁকে বলা হয়েছে স্তম্ভ (গালাতীয় ২:৯) এবং তাঁর এই পত্রটিও নিঃসন্দেহে পবিত্র শাস্ত্রের জন্য ভিত্তি-প্রস্তরের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র।

এই পত্রটিকে সার্বজনীন পত্র বলা হয়েছে, কারণ (অনেকের মতে) এই পত্রটি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা মণ্ডলীকে সম্বোধন করে লেখা হয় নি। এ ধরনের পত্র সাধারণত পালাক্রমে বিভিন্ন মণ্ডলীতে প্রেরণ করা হত। অন্যদের মতে এই পত্রটিকে সার্বজনীন বলা উচিত এ কারণে, যেন তা ইগনেশিয়াস, বার্ণবা, পলিকার্প ও প্রাথমিক মণ্ডলীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পত্র থেকে পৃথক করে দেখানো যায়, যাদের পত্রগুলো মণ্ডলীতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত হয় নি এবং যে কারণে সেগুলো এই পত্রটির মত ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ইউসেবিয়াস আমাদেরকে বলছেন যে, এই পত্রটি মণ্ডলীর অন্যান্য ক্যাথলিক পত্রের সাথে পাঠ করা হত (His. Eccles. page 53. Ed. Val. Anno 1678)| এই পত্রের লেখক যাকোব তাঁর আধ্যাত্মিকতার কারণে ধার্মিক নামে সম্বোধিত হতেন। তাঁর ভেতরে যে অনুগ্রহের দানগুলো ছিল সেগুলো অন্যদের মাঝে সঞ্চার করার জন্য তিনি ছিলেন এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তিনি এই ন্যায্যতা, দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও আধ্যাত্মিকতার কারণে এতটাই সম্মানের পাত্র ছিলেন যে, যিহূদী ইতিহাসবিদ যোসেফাস এটিকে যিরূশালেম ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ বলে ব্যক্ত করে বলেছেন, "প্রেরিত যাকোব এই নগরের ভেতরে সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন।"

এই সমস্ত বিষয়ের কারণে পত্রটি লেখকত্ব এটিকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বসনীয় করে তুলেছে। কোন্ সময়ে এই পত্রটি লেখা হয়েছে তা অনিশ্চিত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রীষ্টানদেরকে তাদের বিশ্বাস ও আচরণের চরম অবক্ষয়ের জন্য তিরস্কার করা এবং যে সকল উদ্ভূত মতবাদ সমস্ত ধার্মিকতা ও পবিত্রতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল সেগুলোকে প্রতিরোধ করা। সেই সাথে লেখকের আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তাদের উপরে আসন্ন যে বিচার নেমে আসছে তার ব্যাপকতা সম্পর্কে বলা এবং প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বসীকে তাদের দায়িত্ব পালন, নির্যাতন ও দুর্যোগের ভেতরেও টিকে থাকার জন্য উৎসাহিত করা। এখানে যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো যেমন সেই যুগে উপযুক্ত ছিল, তেমনি বর্তমানেও তা সমানভাবে যুগোপযোগী।

যাকোবের লেখা পত্র

অধ্যায় ১

পত্রের লেখকের নাম উল্লেখ এবং সম্ভাষণ জানানোর পর (পদ ১) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কীভাবে ক্রুশের অধীনে এসে জীবন ধারণ করবেন সে সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হয়েছে। একাধিক অনুগ্রহ ও দায়িত্বের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। যারা এই পত্রের লেখক প্রেরিত যাকোবের মত পরীক্ষা ও কষ্টভোগ করেছেন তাদেরকে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের পাত্র বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য রক্ষিত বিশেষ গৌরবময় পুরস্কারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, পদ ২-১২। কিন্তু যে সমস্ত পাপের কারণে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসে বা মানুষ যে সমস্ত দুর্বলতা ও ভুলের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেগুলোর জন্য কোনভাবেই ঈশ্বরকে দায়বদ্ধ করা যায় না, কারণ ঈশ্বর পাপের স্রষ্টা নন এবং তাঁর দ্বারা শুধু মঙ্গলই সাধিত হয়, পদ ১৩-১৮। আমাদের মধ্যকার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি, বদ মেজাজ এবং মন্দতার প্রতি আসক্তি দমন করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের মূল ধ্যান-জ্ঞান করে তুলতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা যা কিছু শুনি ও জানতে পাই, তা আমাদেরকে সঠিকভাবে চর্চা করতে হবে, নতুবা আমাদের ধর্ম পালন ব্যর্থ হবে। এর সাথে পবিত্রতার মধ্য দিয়ে কীভাবে ধর্ম পালন করা উচিত সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি যুক্ত করা হয়েছে, পদ ১৯-২৭।

যাকোব ১:১ পদ

প্রথমেই আমরা দেখি পত্রটির নাম স্বাক্ষর ও লেখকের পরিচিতি। এর তিনটি প্রধান অংশ রয়েছে।

ক. যে নামে আমাদের লেখক নিজেকে পরিচয় দিতে চেয়েছেন: *ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকোব*। যদিও যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে তিনি ছিলেন একজন প্রধান মন্ত্রী, তথাপি তিনি নিজেকে কেবল তাঁর একজন দাস বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে নেতৃত্ব পর্যায়ে বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন তারা একান্তই দাস বা পরিচর্যাকারী। তাদের কখনোই নিজেদেরকে প্রভু হিসেবে মনে করে কর্তৃত্ব করা উচিত নয়, বরং তাদের সব সময় পরিচর্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া যদিও যাকোবকে সুসমাচার রচয়িতাগণ যীশু খ্রীষ্টের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন, তথাপি খ্রীষ্টের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দেওয়ার বদলে তাঁর জন্য পরিচর্যা ও সেবা কাজ করার মধ্যে আরও বেশি গৌরব ও মহিমা নিহিত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর অন্য যে কোন পদমর্যাদার চেয়ে এই পদটি ধারণ করা আমাদের জন্য আরও অনেক বেশি গর্বের ও

সম্মানের – *ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের দাস*। আবার এটিও দেখার বিষয় যে, যাকোব নিজেকে ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের দাস হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা পিতার পাশাপাশি পুত্রকেও সমান মর্যাদায় ভূষিত করি। পিতাকে আমরা কখনোই পরিপূর্ণভাবে পরিচর্যা করতে পারি না যদি আমরা পুত্রের দাস না হই। ঈশ্বর চান, সমস্ত মানুষ পিতাকে যেমন সমাদর করে তেমনি পিতাকে সমাদর করুক, যোহন ৫:২৩। খ্রীষ্টের কাছে এসে মন পরিবর্তন করা ও তাঁর সহায়তা কামনা করা এবং তাঁর প্রতি সর্বাংশে বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে প্রভু হিসেবে যখন আমরা স্বীকার করি, তখন আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি।

খ. যাদের কাছে কাছে প্রেরিত যাকোব এই পত্রটি লিখছেন তাদের অবস্থা তিনি এখানে ব্যক্ত করছেন: *নানা দেশে ছড়িয়ে পড়া বারো বংশ*। অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে স্তিফানের উপর নির্যাতনের সময় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া যিহূদীদের কথা বলা হয়েছে, প্রেরিত ৮ অধ্যায়। কিন্তু তারা কেবল যিহূদিয়া ও শমরীয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যরা ছড়িয়ে পড়া যিহূদী বলতে মনে করেন যারা যুদ্ধের কারণে আশেরিয়া, বাবিল, মিসর ও অন্যান্য রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। বারোটি বংশের মধ্যে দশটির বংশের অধিকাংশ লোকই নিঃসন্দেহে বন্দীত্বের সময় তাদের জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তারপরও বারো বংশ থেকে কিছু সংখ্যক লোক টিকে ছিল এবং তারা সসম্মানে বারো বংশের প্রাচীন রীতি-নীতি অনুসরণ করত। তবে এই বারোটি বংশ বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় বসবাস করত।

১. তাদের উপরে দয়া করার কারণে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে জীবন ধারণ করতে পেরেছিল। পুরাতন নিয়মের বাক্য অনুসারে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশে মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

২. এখন তাদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসার জন্য তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যিহূদী জাতি এখন বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই জাতিগত কোন্দলের কারণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। অনেক ভাল মানুষকেও এই দুর্যোগে পড়তে হয়েছে।

৩. ছড়িয়ে পড়া এই যিহূদীরা ছিল তারা, যারা খ্রীষ্টিয় ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং তারা অন্যান্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। অযিহূদীরা যিহূদীদের তুলনায় খ্রীষ্টানদের প্রতি তুলনামূলক বেশি দয়ালু ছিল। এখানে লক্ষ্য করুন, অনেক সময় ঈশ্বরের নিজ জাতির লোকদেরও নিজ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হতে হয়, উদ্বাস্তু হতে হয়। কিন্তু শেষ দিনে তারা সকলে একত্রিত হবে যীশু খ্রীষ্টের কাছে। তখন পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে গৃহহীন ও বিতাড়িত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে মস্তকরূপ খ্রীষ্টের কাছে একত্রিত করা হবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত যখন ঈশ্বরের জাতির লোকেরা বিভিন্ন ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় বসবাস করবে, সে সময় তিনি তাদের দেখাশোনা করবেন। এই পত্রে আমরা দেখি একজন প্রেরিত এই সকল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের কাছে পত্রটি

লিখেছেন। এই পত্র তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত পত্র, কারণ ঈশ্বর প্রেরিত যাকোবকে প্রতিনিধি মনোনীত করে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নিজেই এই পত্র রচনা করেছেন। লোকেরা যখন ঈশ্বরকে ভুলে যায় ও তাদের কৃতকর্মের জন্য কষ্টভোগ করে, তখনও তিনি তাদেরকে ছেড়ে যান না। তিনি তাদের জন্য তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর প্রেরিতকে তাদের পরিচর্যা কাজের জন্য প্রেরণ করেন। যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তক থেকে আমরা এ বিষয়ে আরও ভালভাবে দেখতে পাই, যিহিস্কেল ১১:১৬। ঈশ্বর তাঁর নিজ জাতির লোকদেরকে বিশেষ যত্ন বিধান করে থাকেন। ঈশ্বরের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাদের নিজেদেরকে অধিকার-বঞ্চিত বলে ভাবার কোন কারণ নেই। অপরদিকে, বাহ্যিক কষ্ট ও প্রতিকূলতার কারণে যদি আমরা পার্থিব কোন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হই, তাহলে আমাদেরকে ঈশ্বর ভুলে গেছেন এমনটা ভাবার কোন অবকাশ নেই, কারণ ঈশ্বর পৃথিবীর প্রত্যেকটি কোণে কোণে অবস্থানকারী তাঁর লোকদেরকে সান্ত্বনা দেন।

গ. এখানে যাকোব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া বিশ্বাসীদেরকে সম্ভাষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শন করছেন। তিনি তাদের জন্য শান্তি ও পরিত্রাণ কামনা করছেন। প্রকৃত খ্রীষ্টানদের অবশ্যই তাদের কষ্টভোগের প্রকৃত মূল্যায়ন করা উচিত। প্রেরিত যাকোবের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, যারা বিভিন্ন দেশে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় বসবাস করছিলেন, তারা যেন সান্ত্বনা পায়, যেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয় এবং তারা যেন তাদের দুর্দশার মধ্যেও আনন্দ করতে পারে। সকল স্থানে এবং সকল সময়ে ঈশ্বরের লোকদের আনন্দ করা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করলে তিনিই আমাদের সকল ভার বহন করবেন।

যাকোব ১:২-১২ পদ

এখন আমরা পত্রটির মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করেছি। পত্রের এই অংশে আমরা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারি:-

ক. এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টানদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এখানে অত্যন্ত গঠনমূলকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। খুব সরল ও প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় একত্রিত করে বক্তব্যটি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

১. এখানে আপাতদৃষ্টিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, উত্তম খ্রীষ্টানদের জন্য দুর্দশা ও কষ্টভোগই স্বাভাবিক নিয়তি। এমন কি যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী তারাও এর ব্যতিক্রম নয়। যারা জীবনে খুব কমই আনন্দ উপভোগ করেছে তারাও তাদের বিশ্বাসের কারণে মহা কষ্টভোগ করতে পারে। ভাল মানুষেরা তাদের জীবনাচরণের কারণে যদি কষ্টভোগ করে, এমনকি দেশছাড়া হয়, তাতেও তাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই।

২. এই সকল পার্থিব পীড়ন ও যন্ত্রণা তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। শয়তান মানুষকে

যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশের ভয় দেখিয়ে পাপের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং তাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে বা তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এই সকল যন্ত্রণা, পীড়ন ও কষ্টভোগ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে এবং তিনি এই সকল পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অনুগ্রহযুক্ত করতে পারেন। স্বর্ণকে আগুনে পোড়ানোই হয় এ কারণে, যেন তা আরও খাঁটি হয়ে ওঠে।

৩. এই সকল পরীক্ষা ও প্রলোভন প্রচুর পরিমাণে আসতে পারে। এ কারণেই প্রেরিত যাকোব বলেছেন, *নানা রকম পরীক্ষা*। আমাদের পরীক্ষাগুলো সংখ্যায় প্রচুর ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সেজন্য আমাদের ঈশ্বরের সম্পূর্ণ যুদ্ধসজ্জা পরিধান করা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকটি দিক থেকে সশস্ত্র থাকা দরকার, যেহেতু পরীক্ষা আমাদের সব দিকেই বিরাজ করছে।

৪. একজন ভাল মানুষ কখনো নিজের উপরে পরীক্ষা ডেকে আনে না, কিংবা তার পাপের কারণে সেই পরীক্ষা আসে তাও নয়। কিন্তু সে ভালভাবে ও ধার্মিকতার সাথে জীবন ধারণ করে বলেই তার জীবনে পরীক্ষা দেখা দেয়। এ কারণে ভাল মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় জর্জরিত হয়।

খ. এখানে পরীক্ষা ও পীড়নের কারণে যে অনুগ্রহ ও তার সাথে সাথে যে দায়িত্ব আমাদের উপরে বর্তায় সে সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা যদি অনুগ্রহ ও দানে বৃদ্ধি লাভ না করি, তাহলে যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের সময় তা আমাদেরকে কোনভাবে সহায়তা দান করবে না।

১. আয়ত্ব করা উচিত এমন একটি খ্রীষ্টিয় অনুগ্রহের নাম হচ্ছে আনন্দ: *তা সর্বতোভাবে আনন্দের বিষয় বলে মনে করো*, পদ ২। পরীক্ষার সময় আমাদের কোনভাবেই দুঃখ ও বিষাদ ভারাক্রান্ত অন্তর ধারণ করা উচিত নয়, কারণ তাতে করে আমরা পরীক্ষা সময় আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ব। বরং আমাদের উচিত হবে নিজ নিজ আত্মাকে উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে রাখা, যেন এই পরীক্ষার মাঝেও আমরা কোনভাবে ভেঙ্গে না পড়ি। দর্শন শাস্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রতিকূলতার মাঝে মানুষকে শান্ত সমাহিত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমাদের সব সময় আনন্দিত থাকতে হবে, কারণ এই আনন্দের উৎপত্তি ঈশ্বরের প্রতি ভীতি থেকে নয়, বরং তাঁর প্রতি ভালবাসা থেকে। এই আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের মস্তক হিসেবে স্বীকার করি এবং তিনি আমাদের সহায় হিসেবে প্রকাশিত হন। ধার্মিকতার কারণে কষ্টভোগ করার মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের মাঝে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর বৃদ্ধি সাধনের জন্য অবদান রাখি। আমাদের এই পরীক্ষা ও দুঃখভোগ আমাদের চূড়ান্ত ও অনন্ত মুকুট প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন আমাদের পরীক্ষা ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তখন তা আনন্দের বিষয় বলে গণ্য করাই আমাদের জন্য কর্তব্য। আমরা যে নতুন নিয়মেই শুধু এই মতবাদটি দেখি তা নয়। ভাববাদী ইয়োবের সময়ও বলা হয়েছিল, সেই ব্যক্তিই সুখী ঈশ্বর যাকে শাস্তিভোগ

করান। অন্যান্য বিভিন্ন অনুগ্রহের কথা বিবেচনা করলে আমরা দুঃখভোগের মাঝেও আনন্দ করার আরও অনেক কারণ খুঁজে পাব।

২. বিশ্বাস এমন একটি অনুগ্রহ যেখানে ধৈর্য ও নির্ভরতা দুটোরই প্রয়োজন হয়: *জেনো, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে*, পদ ৩; এবং এর পরে পদ ৬, *সে সন্দেহ না করে বিশ্বাস সহকারে যাচঞা করুক*। পরীক্ষার সময় খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের মহান সত্যগুলোর প্রতি এক অটল বিশ্বাস পোষণ করা ও তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এখানে যে ধরনের বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে তা ঈশ্বরের শক্তি, তাঁর বাক্য, তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহ এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতা ও নির্ভরতার এক অপূর্ব সমন্বয়।

৩. অবশ্যই আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে: *বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে*। এই অনুগ্রহের দান পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আরেকটি দানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কোন একটি অনুগ্রহের দান যত বেশি কষ্টভোগের সম্মুখীন হবে, তা তত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য উৎপন্ন করে, রোমীয় ৫:৩। এখন, খ্রীষ্টিয় ধৈর্যকে সঠিকভাবে চর্চা করার জন্য আমাদেরকে যা অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে:-

(১) দুঃখ-কষ্টের মাঝেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এটি কোন মূর্খতাসূচক ভাবনা নয়। বরং খুবই যুগোপযোগী ও কার্যকরী এই ভাবনাটি। স্টোয়িকীয় নির্লিপ্তবাদ ও খ্রীষ্টিয় ধৈর্য কোন সমার্থক মতধারা নয়। প্রথমটি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে মানুষ দুঃখ-কষ্ট সইতে সইতে এক সময় তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ও তা স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। আর দ্বিতীয় মতধারা, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ধৈর্য ধারণের মধ্য দিয়ে মানুষ সেই দুঃখ-কষ্টকে কাটিয়ে ওঠে এবং তার উপরে বিজয় লাভ করে। আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত যেন আমাদের ভেতরে ক্রোধ নয়, বরং ধৈর্য কাজ করে। আমরা এ সময়ে যা কিছুই বলি বা করি না কেন তা যেন ধৈর্য থেকে আসে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত অভিলাষ ও অভিপ্রায়কে দমন করে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ধৈর্যপূর্ণ আচরণ সমস্যামুখর সময়ে অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারে।

(২) আমাদের ধৈর্য যেন সর্বোচ্চ ফল দান করতে পারে সেই চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। এমন কোন কিছু করা চলবে না যা একে সীমিত করে দেয় বা দুর্বল করে দেয়। পীড়নের পেষণে যদি আমরা জর্জরিত হতে থাকি, যদি দুঃখ আমাদের উপর চেপে বসে জগদ্দল পাথরের মত, তারপরও আমাদের ধৈর্য যেন সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় থাকে সেই প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যখন আমরা সঠিকভাবে পালন করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতাপূর্ণ দৃষ্টি রাখি, তখন যে কোন বাধা আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং আমাদের ধৈর্য আমাদেরকে সফল করে তোলে।

(৩) ধৈর্যের কাজ যখন সম্পন্ন হয় তখন একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেন এবং তার মধ্যে আর কোন অপূর্ণতা থাকে না। আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য ও অনন্ত জীবন লাভের জন্য যা কিছু অর্জন করা প্রয়োজন তা আমরা ধৈর্য ধারণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে

অর্জন করতে পারি। এতে করে আমরা শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে ধার্মিক ও পবিত্র বলে প্রতীয়মান করতে পারি এবং আমরা তখন মহিমার মুকুটে উদ্ভাসিত হই।

৪. দুঃখভোগকারী খ্রীষ্টানদের জন্য আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে প্রার্থনা করা। এখানে প্রেরিত যাকোব বলছেন:-

(১) যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের আরও বেশি প্রার্থনা করা প্রয়োজন – জ্ঞান: যদি আমাদের মধ্যে কারও জ্ঞানের অভাব হয় তাহলে সে যেন ঈশ্বরের কাছে যাচঞ্চা করে। কোন একটি কষ্ট আমাদের উপর থেকে তুলে নেওয়ার প্রার্থনা না করে বরং আমাদের উচিত ঈশ্বর যেন সেই কষ্ট ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের জ্ঞান দেন সেই প্রার্থনা করা।

(২) কীভাবে আমরা এই জ্ঞান লাভ করতে পারি: যাচঞ্চা বা বিনতি করার মধ্য দিয়ে। মূর্খেরা যদি অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে যাচঞ্চা করে তাহলে তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হবে। এই জ্ঞান মানুষের কাছ থেকে পাওয়া যায় এমন কোন জ্ঞান নয়, বরং তা একান্তরূপে ঈশ্বরের কাছ থেকে অর্জন করা যায় এমন জ্ঞান। একমাত্র ঈশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক। এ কারণে আমাদের যার যতটুকু জ্ঞান রয়েছে তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আরও জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য যাচঞ্চা করা প্রয়োজন।

(৩) প্রার্থনা করার জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক একটি বিষয় আমাদের সামনে রয়েছে: *তিনি তিরস্কার না করে সকলকে অকাতরে দিয়ে থাকেন*। হ্যাঁ, তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তা দেওয়া হবে। আমাদের অন্তরে যত হতাশাই থাকুক না কেন, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি তখন তা আমাদের মধ্য থেকে দূর হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সরে যায়। তাঁর কাছে এসে যখন আমরা তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য উপযোগী জ্ঞান যাচঞ্চা করি, তখনই তিনি তা আমাদেরকে দান করেন। তাঁর কাছে অনুগ্রহ যাচঞ্চা করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনভাবে ভীত হওয়ার অবকাশ নেই। তিনি সব সময়ই চান যেন আমরা তাঁর কাছে আসি এবং তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করি। তিনি আমাদেরকে তাঁর মহা অনুগ্রহ দান করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়েই আছেন। আমাদের কেবল তাঁর কাছে আসতে হবে এবং আত্মার বিনম্রতায় ও ভক্তিতে তাঁর কাছে অনুগ্রহ যাচঞ্চা করতে হবে।

(৪) আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে যাচঞ্চা করব তখন একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে মাথায় রাখতে হবে। আর তা হচ্ছে, আমরা যা কিছুই যাচঞ্চা করি না কেন তা যেন অটল বিশ্বাস সহকারে যাচঞ্চা করি: কোন প্রকার সন্দেহ না করে আমাদের বিশ্বাস সহকারে যাচঞ্চা করা প্রয়োজন। উপরে যে প্রতিজ্ঞার কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে তা একান্তভাবে সুনিশ্চিত। যারা ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান যাচঞ্চা করবে তাদেরকে তা দেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত প্রযোজ্য। আর সেই শর্ত হচ্ছে, ঈশ্বর যে তাদেরকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ করতে সমর্থ সে ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ধারণ করতে হবে এবং সেই জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে। যারা যীশু খ্রীষ্টের কাছে সুস্থ হতে আসত

তাদের ক্ষেত্রে তিনি এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, “আমি যে এই কাজ করতে সক্ষম তা কি তুমি বিশ্বাস কর?” এই ক্ষেত্রে কোন ধরনের সন্দেহ থাকা চলবে না। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলে তা কখনোই আমাদের জীবনে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে না। এ কারণে আমাদের নিজেদেরকে বিশ্বাসে দৃঢ় অবস্থানে দাঁড় করাতে হবে।

৫. ঐক্য, চিন্তার শুদ্ধতা ও অন্তরের অবিচলতা, যা কষ্টভোগের মাঝেও পরস্পরকে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্রিয় করে তোলে: কেননা যে সন্দেহ করে সে বাতাসে দুলে ওঠা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। এ ধরনের মানুষ কখনো বিশ্বাসে ভর করে উপরে ভেসে ওঠে, আবার কখনো বিশ্বাসচ্যুত হয়ে নেমে আসে পতনের দিকে। কখনো সে স্বর্গের দিকে যাত্রা শুরু করে, তার নিজ গৌরব, মহিমা, সম্মান ও অমরত্বকে নিশ্চিত করে তোলে, এবং এরপরে আবারও তার দেহের আরাম আয়েশের দিকে মনোনিবেশ করে এবং পার্থিব আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। উত্তাল কোন সমুদ্রের টালমাটাল ঢেউয়ের সাথে খুব সহজে এ ধরনের মানুষ তুলনা করা যায়। এ ধরনের উথাল পাথাল ঢেউ যেমন একবার ওঠে আর পরক্ষণেই ডুবে যায়, ঠিক সেভাবেই এ ধরনের মানুষের মন ও চিন্তা প্রথমে ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তা সব সময় স্বর্গীয় নির্দেশনায় চলতে থাকে এবং একান্তভাবে ঈশ্বরের পথে স্থির থাকে। কিন্তু এক সময় তা পার্থিব চিন্তাধারা ও মোহের কারণে ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এ ধরনের দোদুল্যমান আত্মা ও দুর্বল বিশ্বাসের ফলে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব জীবনে দেখা দেয় সেগুলো সম্পর্কে প্রেরিত পিতর এখানে বলেছেন:-

(১) বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে প্রার্থনার সাফল্য অর্জন ব্যহত হয়: সেই ব্যক্তি প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবে এমন আশা না করুক, পদ ৭। এ ধরনের অবিশ্বাসী, পরিবর্তনশীল ও দোদুল্যমান মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন ধরনের অনুগ্রহ চাইতে পারে না। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা কখনো এই সকল অনুগ্রহ দাবী করতে পারি না, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে যাচঞ্ঞা করতে পারি বা অনুরোধ জানাতে পারি। স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের জন্য হাজার অনুনয় বিনয় করলেও তা কখনো আমাদের হবে না, যদি আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান লাভের জন্য পবিত্রতা ও ধার্মিকতাপূর্ণ অন্তর না থাকে। মহৎ বস্তু অর্জন করার জন্য নিজেদেরও মহত্ব অর্জন করতে হয়।

(২) দোদুল্যমান বিশ্বাস এবং আত্মা আমাদের জীবনাচরণের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে দ্বিমনা লোক, নিজের সকল পথে সে অস্থির, পদ ৮। আমাদের বিশ্বাস এবং আত্মা যখন কোন কারণ ছাড়াই একবার উত্থিত হয় এবং আরেকবার পতিত হয়, তখন আমাদের জীবনের সব ধরনের আচরণে এবং কার্যক্রমে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে করে মানুষ অনেক সময় এই পৃথিবীতে সুখী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যে কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না, সেই কাজ কখনো আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারে না। যেখানে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের জন্য কেবল একজনই ঈশ্বর রয়েছে, তখন কেন আমরা এমন কাজ করব না যা

তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য? আমাদের উচিত সব সময় তাঁর অধীনে পরিচালিত হওয়া এবং নিজেদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসে স্থির রাখা। যে ব্যক্তি উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অস্থির, সে কখনো ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে পারে না।

গ. একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আচরণ, জীবনাদর্শ ও মনোভাব কেমন হওয়া উচিত তা এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে ধনী ও গরিব উভয়েই কীভাবে তাদের জীবন উপভোগ করবে ও আনন্দে কাটাবে তাও এখানে বলা হয়েছে, পদ ৯-১১। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. যারা সমাজের নিচু স্তরের মানুষ, তথা দরিদ্র, তাদেরকে আমাদের ভাইয়ের মত করে দেখতে হবে: যে ভাই অবনত তাকে উন্নত করা হয়েছে বলে সে গর্ব করুক। দারিদ্রতার কারণে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় না।

২. উত্তম খ্রীষ্টিয়ানরা এই পৃথিবীতে ধনী হতে পারেন, পদ ১০। অনুগ্রহ ও পার্থিব সম্পদ কখনো পরস্পরের বিরোধী নয়। ঈশ্বরভক্ত ও বিশ্বস্ত অব্রাহাম স্বর্ণ ও রৌপ্যে মহা ধনী ছিলেন।

৩. এই দুই দানই উপভোগ করার জন্য অনুমোদনীয়। ঈশ্বরতে আনন্দ করার জন্য আমাদের কোন ধরনের অজুহাতের অবকাশ নেই। যদি আমরা সব সময় তাঁতে আনন্দ না করি, তাহলে তা আমাদেরই ব্যর্থতা। যারা নিচু অবস্থানে রয়েছে তারাও এ কারণে ঈশ্বরতে আনন্দ করতে পারে যে, ঈশ্বর তাদেরকে বিশ্বাসে উন্নত করেছেন এবং তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেছেন। ধনীরা এ কারণে আনন্দ করতে পারেন যে, তারা সম্পদের অধিকারী হলেও নম্র অন্তরের অধিকারী হয়েছেন এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, যা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যখন কেউ ধার্মিকতার জন্য দারিদ্রকে বরণ করে, তখন তাদের সেই দারিদ্রই তাদের জন্য সম্মানের বিষয় হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টের জন্য অপমানিত হওয়াটাই মহা সম্মানের বিষয়। কষ্টভোগ করাটাই খ্রীষ্টানদের জন্য সবচেয়ে বরণীয়, ফিলিপীয় ১:২৯। যারা অনুগ্রহের দ্বারা নত হয়েছেন, তারা স্বর্গের তাদের জন্য সঞ্চিত পুরস্কারের কথা ভেবে আনন্দ করতে পারেন।

৪. লক্ষ্য করুন, ধনীরা যতই সম্পদশালী বা প্রভাবশালী হোক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের চোখে ও ঈশ্বরের চোখে নম্র ও নত হতে হবে, কারণ তারা ও তাদের এই সমস্ত সম্পদ খুব দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে: সে ফুলের মতই ঝরে যাবে, পদ ১১। ফলত সূর্য যখন জ্বলন্ত তাপ নিয়ে ওঠে তখন ঘাস শুকিয়ে যায়। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, পার্থিব সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু বস্তু। মানুষের সম্পদ একান্তই অস্থায়ী বিষয় এবং আমাদের আত্মার জন্য তা একান্তই অপ্রয়োজনীয় বস্তু। ফুল যেমন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়, ঠিক সেভাবেই ধনী ব্যক্তির সমস্ত প্রতিপত্তি ও সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। সে শুষ্ক হয়ে পড়বে এবং এক সময় তার আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এ কারণে যে ধনী সে এই ভেবে আনন্দ করুক যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে পৃথিবীতে এই সকল সম্পদ আহরণ করেছে এবং

সে কথা চিন্তা করে সেই ব্যক্তি নম্র হোক। তার পরীক্ষা ও প্রলোভনের কালে সে যেন সেই সকল ক্ষণস্থায়ী সম্পদের কাছে আশ্রয় না খুঁজে ঈশ্বরের কাছে খোঁজে।

ঘ. যারা তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য এক চমৎকার দোয়া-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে: ধন্য সেই ব্যক্তি যে পরীক্ষা সহ্য করে, পদ ১২। লক্ষ্য করুন:-

১. যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে সেই ব্যক্তিই যে অনুগ্রহ লাভ করবে তা নয়, বরং যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে সে-ই অনুগ্রহ লাভ করবে। তার পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সে তার বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দূরে সরিয়ে দেবে।

২. কষ্টভোগের কারণে আমরা কেবল তখনই দুর্দশাগ্রস্ত হই, যখন তা আমাদের নিজেদের কোন ভুলে কারণে ঘটে থাকে। ধার্মিকতার কারণে কষ্টভোগ করার মাঝে নিহিত থাকে অনুগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহ দ্বারা আমরা আশীর্বাদ লাভ করতে পারি। একজন উত্তম বিশ্বসীকে এ ধরনের কষ্টভোগ কখনো বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

৩. কষ্টভোগ ও পরীক্ষাই আমাদের অনন্ত জীবন লাভের সর্বোত্তম উপায়: *যোগ্য প্রমাণিত হলে পর সে জীবন মুকুট লাভ করবে*। যখন ঈশ্বর তাকে যোগ্য বলে রায় দেবেন, যখন তার সমস্ত অনুগ্রহ যথাযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তাকে খাঁটি ও পবিত্র বলে অনুমোদন দেওয়া হবে, তখন তাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনন্ত জীবন লাভের জন্য চূড়ান্তভাবে রায় দেবেন। এখানে লক্ষ্য করুন, এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া, তাঁর অনুমোদন লাভ করা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খ্রীষ্টানদেরকে এক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে, আর সে এই মুকুট সে জীবন মুকুট হিসেবে মাথায় নেবে। এই মুকুট হবে্ তার জন্য জীবনের শান্তি ও সুখ। আর এই পুরস্কার তার জন্য চিরকাল থাকবে। আমরা এখন ক্ষণিকের জন্য খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করছি। কিন্তু আমরা চিরকাল যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে পরীক্ষাসিদ্ধতার পুরস্কার হিসেবে পাওয়া গৌরবের মুকুট পরিধান করব।

৪. এই জীবন মুকুটের মাঝে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ রয়েছে তা ধার্মিকতায় কষ্টভোগকারীদের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এই বিষয়টির উপরে আমরা নিশ্চিতভাবে নির্ভর করতে পারি, কারণ আসমান ও পৃথিবী বিলীন হয়ে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য কখনো ক্ষয় পায় না, তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনো ব্যর্থ হয় না। আমাদের জন্য ভবিষ্যতের এই যে পুরস্কার সঞ্চিত রয়েছে তা প্রকৃত অর্থে এক অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা।

৫. আমাদের পার্থিব জীবনের দীর্ঘস্থায়ী কষ্টভোগের উৎস হচ্ছে ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই ভালবাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বলেই আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করতে পেরেছি। পৌল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষ যদি ধার্মিকতা প্রকাশের জন্য তার নিজ দেহ পোড়াতেও দিয়ে দেয়, কিন্তু তার মধ্যে কোন ভালবাসা না থাকে, তাহলে সেই আত্মত্যাগ কখনোই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, ১ করিন্থীয় ১৩:৩।

৬. শুধুমাত্র মহান ও আত্মত্যাগী পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এই জীবন মুকুট প্রতিজ্ঞা করা হয়নি। বরং যাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা নিহিত রয়েছে তাদের সকলের জন্যই এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। যত আত্মা সত্যিকারভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে তারা এই পৃথিবীতে পরীক্ষাসিদ্ধ হলে পর উর্ধ্বস্থিত দুনিয়ায় তাদের কষ্টের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাবে। তাদের ভালবাসাকে সেখানে মূল্যায়িত করা হবে।

যাকোব ১:১৩-১৮ পদ

ক. এখানে আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে, ঈশ্বর কোন মানুষের পাপের জন্য দায়ী নন। যারা মানুষের উপরে নির্যাতন চালায় এবং অন্যায় ও পাপ করে, তাদের কাজের জন্য কখনো ঈশ্বরকে দায়ী করা যায় না। ভাল মানুষেরাও তাদের জীবনে চলার পথে কখনো কখনো পাপের প্রলোভনে পড়তে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তা ঘটান না। প্রকৃতপক্ষে এমন অনেকে আছেন যারা পরীক্ষা চলাকালে তাতে পতিত হন এবং মন্দ পথটি বেছে নিয়ে তাদের হাতকে কলঙ্কিত করেন। অথচ তারা পরীক্ষায় পতিত হওয়ার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করেন। কিন্তু তাদের সমস্ত পাপ ও অসদাচরণের জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। কারণ:-

১. ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যে এমন কিছুই নেই যার জন্য তাঁকে দোষী বলা যাবে: পরীক্ষার সময় কেউ না বলুক, ঈশ্বর থেকে আমার পরীক্ষা হচ্ছে। কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যায় না, আর তিনি কারও পরীক্ষা করেন না। যে ব্যক্তি সেই অন্যায় বা পাপ সাধন করবে, বা পরীক্ষায় পতিত হবে, তার মধ্যকার নৈতিক অবক্ষয়ই এর জন্য দায়ী। তার অন্তরে জ্ঞান, বা আত্মিক শক্তি, বা শৃঙ্খলা, বা পবিত্রতার অভাব রয়েছে। কিন্তু এই সকল সদ্‌গুণ না থাকার কারণে কেউ কি কখনো ঈশ্বরকে দায়ী করতে পারে, যা তার নিজেরই অর্জন করে নেওয়া উচিত ছিল? আমাদের কোন প্রকার ঘাটতি, অপূর্ণতা বা অযোগ্যতার কারণে কখনো আমরা ঈশ্বরকে দায়ী করতে পারি না।

২. ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ও মানব জাতির জন্য তাঁর মহা পরিকল্পনায় এমন কোন খুঁত বা অপূর্ণতা নেই যার জন্য মানুষের কোন পাপের দায়ভার ঈশ্বরের উপরে বর্তানো যায় (পদ ১৩): মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যায় না। মন্দ বিষয় দিয়ে যেমন ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা যায় না, ঠিক সেভাবে তিনিও কাউকে পরীক্ষায় ফেলেন না। তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সাথে যা যায় না, তা তিনি কখনোই করতে পারেন না। মাংসিক চিন্তাধারা সব সময় তার পাপের ভার ঈশ্বরের উপরে ফেলে দেওয়ার চিন্তা করে। কিন্তু তা একান্তই পরস্পর বিরোধী। আমাদের আদিপিতা আদম তার পাপে পতিত হওয়ার কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে বলেছিলেন, যে নারী তুমি আমাকে দিয়েছ সে-ই আমাকে ভুলিয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর সেই নারীকে আদমের জন্য দিয়েছিলেন বলে পরোক্ষভাবে আদম ঈশ্বরকেই এই পরীক্ষার জন্য দায়ী করছেন। এভাবে কোন মানুষের কথা বলা উচিত নয়। পাপ করা খুবই খারাপ, কিন্তু সেই পাপের ভার ঈশ্বরের উপরে ফেলা এবং তিনিই সেই পাপের জন্য দায়ী এমন

ভাব প্রকাশ করা আরও খারাপ। যারা তাদের পাপের ভার এই পৃথিবীর কোন ঘটনার উপরে বা অন্য কোন মানুষের উপরে ফেলে, বা যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে পাপ করতে বাধ্য হয়েছে এমন ভাব প্রকাশ করে, তারা ঈশ্বরকেই দোষী সাব্যস্ত করে। তাদের কথায় ও কাজে তারা এমন ভাব প্রকাশ করে, যেন তাদের এই পাপের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই দায়ী। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের উপরে যে পীড়ন ও কষ্ট নেমে আসে তার উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যকার অনুগ্রহের দানগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলা, কিন্তু আমাদের ভেতরে পাপের জন্ম দেওয়া নয়।

খ. আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে, মন্দতার প্রকৃত কারণ কোথায় নিহিত থাকে এবং এর জন্য কাকে মূলত দোষী করা যায় (পদ ১৪): প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হয়ে পরীক্ষিত হয়। অন্যান্য অনেক অনুবাদে শয়তানকে বলা হয়েছে প্রলোভনকারী। এছাড়া আরও অনেক জিনিস অনেক সময় আমাদেরকে প্রলোভন ও পরীক্ষায় ফেলে। কিন্তু শয়তান বা অন্য কোন কিছুর উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা নিজেদের পাপের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে পারি না। আমাদের নিজেদের অন্তরেই সত্যিকারের মন্দতা ও প্রলোভন নিহিত থাকে। আগুনের ফুলকি আমাদের অন্তরেই অবস্থান করে, অবশ্য বাহ্যিক কোন প্ররোচণার কারণে সেই ফুলকি দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠে। এ কারণেই শলোমন বলেছেন, যদি আমরা পাপ করি তাহলে আমাদের একাকী তার দায়ভার বহন করতে হবে, হিতোপদেশ ৯:১২। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. পাপ কীভাবে আমাদেরকে গ্রাস করে। প্রথমে তা আমাদেরকে পবিত্রতা ও ধার্মিকতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে এবং এর পরে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে। পবিত্রতা দুটো বিষয় নিয়ে রূপলাভ করে – যা কিছু মন্দ তা ত্যাগ করা এবং যা কিছু উত্তম তার সাথে সংযুক্ত থাকা। যখন আমরা পাপে পতিত হই তখন এই বিষয়টি উল্টে যায়। তখন যা কিছু উত্তম তা থেকে আমাদের অন্তর দূরে সরে যায় এবং যা কিছু মন্দ তা আঁকড়ে ধরে। মন্দতার প্রতি আকর্ষণ ও অনৈতিক অভিলাষই আমাদের ঈশ্বরতে ভক্তিময় জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ও পাপে পতিত হওয়ার মূল কারণ।

২. এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি পাপের ক্ষমতা ও কার্যকারণ। এখানে আকর্ষিত হওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে জোরপূর্বক কোন কিছুতে আকৃষ্ট করা বা মোহিত করা। প্ররোচিত বলতে বোঝানো হয়েছে কোন মন্দ বস্তুর মোহনীয় আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠা, *exelkomenos kai deleazomenos*। মন্দতায় জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনা ও অন্তরের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। পাপের প্রতি আকর্ষণ জন্মানোর জন্য তা নানাভাবে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে ও তোষামোদি করতে থাকে। পাপের শক্তি ও ক্ষমতা কখনোই মানুষের উপরে জয় লাভ করতে পারত না, যদি তা শঠতার আশ্রয় না নিত। যারা পাপে পতিত হয়, তারা পাপ ও মন্দতা দ্বারা প্ররোচিত ও আকৃষ্ট হয়ে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে। পাপ তাদের দরজায় ওৎ পেতে থাকে এবং তারা সাদরে তা ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে। এ কারণে পা যীশুর মানুষের নিজ

রক্তের দায়ভার তার মাথার উপরেই বর্তায়।

৩. মানুষের অন্তরে পাপের জয় লাভ (পদ ১৫): *কামনা সগর্ভা হয়ে পাপ প্রসব করে*। অর্থাৎ আমরা যখন পাপ-স্বভাবকে আমাদের অন্তরের সুপ্ত অভিলাষ ও কামনা-বাসনা জাগিয়ে তোলার জন্য সুযোগ দিই, তখন তা আমাদের ভেতরে কামনা থেকে তৈরি হয় এমন পাপের সূত্রপাত ঘটায়। ঠিক তখনই আমাদের ভেতরে পাপ জন্ম নেয় ও প্রকাশ পায়। এর আগ পর্যন্ত পাপ আমাদের অন্তরে অবস্থান করে, কিন্তু সুপ্তভাবে। যখন তা পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ধারণ করে, তখন তা আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ কারণে পাপকে শুরুতেই প্রতিরোধ করতে হবে। নতুবা আমাদের অন্তরের সমস্ত উত্তমতা পরিবর্তিত হয়ে মন্দতায় রূপ নেবে এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য কোন পথ আর আমরা খুঁজে পাব না।

৪. যেভাবে পাপের পরিসমাপ্তি ঘটে: *পাপ পরিপক্ক হয়ে মৃত্যুকে জন্ম দেয়*। পাপ যখন তার আসল কাজ সম্পন্ন করে, অর্থাৎ মানুষের ভেতরে চূড়ান্ত মন্দতার জন্ম দিয়ে তাকে পুরোপুরি পা যীশুর করে তোলে, তখন তা থেকে মানুষের বের হয়ে আসার আর উপায় থাকে না এবং মন্দতার মাঝে বসবাস করা ও পাপ করা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে মানুষ যখন তার পাপ ও অনৈতিকতার চূড়ান্ত সীমারেখা অতিক্রম করে, তখন তার উপরে নেমে আসে মৃত্যু। এই মৃত্যু একাধারে আত্মিক এবং দৈহিক। পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। এ কারণে পাপের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়ার আগেই মানুষকে পাপ ত্যাগ করে মন পরিবর্তন করতে হবে। মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর কখনোই খুশি হন না, কারণ মানুষের পাপে তাঁর কোন হাত নেই। আমাদের পাপ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার দায়ভার আমাদের নিজেদেরই। আমাদের নিজেদের অন্তরের কামনা ও কলুষতাই আমাদের প্রলোভনকারী। যখন তা তিলে তিলে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আমাদের উপরে পাপের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই কেবল তা আমাদের ধ্বংসকারী হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

গ. আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আমরা যেমন আমাদের সকল পাপ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্মদানকারী, ঠিক তার বিপরীতে ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা এবং সমস্ত মঙ্গলময়তার উৎসধারা। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানে যেন কোন ধরনের ভ্রান্তি না থাকে সে ব্যাপারে আমাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে: *হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, ভ্রান্ত হয়ো না – সব ষধহধৎঃযব*। অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা যেন বিচ্যুত না হই এবং তিনি আমাদেরকে যে সকল জ্ঞানে পূর্ণ করেছেন তা যেন আমরা ভুলে না যাই। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা যে সকল শিক্ষা লাভ করেছি এবং তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা যে সকল নির্দেশনা আমরা লাভ করেছি, সেই শিক্ষার সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া বা ভুল ধারণা পোষণ করা চলবে না। হয়তো প্রেরিত যাকোব এখানে সিনোন এবং নিকোলাইতীয়দের সম্পর্কে সাবধান করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে উগ্র বস্তুবাদী নস্টিক (এহড়ংঃরপ) মতধারার অনুসারীদের উদ্ভব ঘটে। যারা এ বিষয়ে আরও জানতে চান তারা ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে লেখা ইরেনিয়াসের (ওৎবহধঁং) প্রথম বইটি পাঠ

করতে পারেন। যারা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে না ও মন্দতায় পথ চলে, তারা কখনো এই সত্য গ্রহণ করতে পারে না যে: ঈশ্বর কখনোই কোন মন্দতার সৃষ্টিকারী বা পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না। বরং যা কিছু উত্তম ও মঙ্গল এমন সমস্ত কিছুরই উৎস তিনি। *সমস্ত উত্তম দান ও সমস্ত সিদ্ধ বর উপর থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকে নেমে আসে*, পদ ১৭। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. ঈশ্বর হলেন জ্যোতি বা আলোর পিতা, স্রষ্টা। আমাদের এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান সূর্য ও অন্যান্য তারকারাজি তাঁর হাতেই নির্মিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, দীপ্তি হোক, আর দীপ্তি প্রকাশ পেল। এভাবেই এখানে ঈশ্বরকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আরও একবার ঘোষণা করা হল। "সূর্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ভূমণ্ডল ও মেঘমালার বৈচিত্র্য ও অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে তা দেখতে একেক সময় একেক রকম মনে হয়, পরিবর্তিত মনে হয়। ঠিক সেভাবেই ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের মধ্যকার পরিবর্তন এবং দৃষ্টি ও চেতনার আচ্ছন্নতার কারণে তাঁকে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দেখে থাকি" – ব্যাক্সটার (*ইধীঃবৎ*)। ঈশ্বর হচ্ছেন জ্যোতির্মণ্ডলের পিতা, যাঁর কোন পরিবর্তন নেই, কোন ছায়া নেই, কোন অবলোপন নেই। সূর্য যেমন তার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অপরিবর্তনীয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের তাঁর অনুগ্রহ, প্রত্যাদেশ, মহিমা, সত্তা, বাক্যান্তরে তাঁর সমস্ত কিছুর দিক থেকে অপরিবর্তনীয়। তিনি কখনো ছায়ার মত বদলে যান না, অবস্থান পাল্টান না।

২. প্রত্যেকটি উত্তম দান তাঁর কাছ থেকে আসে। আলো বা নূরের স্রষ্টা হিসেবে তিনিই আমাদেরকে সমস্ত বোধগম্যতা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, যেন তাঁর আলোতে এসে আমরা তাঁর জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হতে পারি। তিনি আমাদেরকে পার্থিব সকল জ্ঞানের আলোতে যেমন পূর্ণ করেন, তেমনি স্বর্গীয় জ্ঞানের আলোও তিনি আমাদেরকে দান করেন। বিশ্বাস, পবিত্রতা ও ভালবাসার আলো তাঁর মধ্য থেকেই নির্গত হয়। এ কারণে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন কিছু থেকেই আমরা উত্তম কোন বিষয় অর্জন করতে পারি না। যা কিছু উত্তম ও মঙ্গল আমরা দেখি তার সবই আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। তাই আমাদের মধ্য দিয়ে যত মন্দতা ও পাপ প্রকাশ পাবে তার সবই আমাদের নিজেদের মন্দ অভিলাষ ও কামনার প্রতিফলন। ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত উত্তমতা ও মঙ্গলময়তার স্রষ্টা ও ধারণকারী। এ কারণে আমাদের মধ্যকার সমস্ত উত্তম বিষয়গুলোর জন্য একান্তভাবে ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য।

৩. প্রত্যেকটি উত্তম দান যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ঠিক সেভাবে আমাদের স্বভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন, আমাদের পুনর্জাগরণ ও এর ফলশ্রুতিতে আমাদের অন্তরে পবিত্র আনন্দের উপস্থিতি, সমস্ত কিছুর জন্য তিনিই কৃতিত্বের দাবীদার (পদ ১৮): *তিনি নিজের বাসনায় সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন*। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

(১) একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এমন এক মানুষ যাকে ঈশ্বর নতুন করে জন্ম দিয়েছেন।

স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা নতুন জন্ম লাভের আগে সে যা ছিল, তা থেকে এখন সে সম্পূর্ণ আলাদা একজন ব্যক্তি। সে আবার নতুন করে জন্ম লাভ করেছে এবং তার জীবন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে।

(২) এই প্রক্রিয়াটির উৎস সম্পর্কে আমরা এখানে জানতে পারি: ঈশ্বর তাঁর নিজ দক্ষতা বা ক্ষমতার কারণে এই কাজ করেন না, বরং তিনি তাঁর ইচ্ছা দ্বারা এই কাজটি করে থাকেন। তিনি আমাদের ভেতরে ভাল কিছু দেখেছেন, বা আমরা ভাল কোন কাজ করেছি বলে যে তিনি আমাদেরকে এই নতুন জীবন দিচ্ছেন তা নয়। বরং তিনি একান্তভাবে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা ও তাঁর অনুগ্রহের কারণে তা করছেন।

(৩) যে প্রক্রিয়ায় তা আমাদের প্রভাবিত করে তা এখানে নির্দেশ করা হয়েছে: সত্যের বাক্য, অর্থাৎ সুসমাচার। এ বিষয়ে পৌল আরও স্পষ্ট করে ১ করি ৪:১৫ পদে ব্যক্ত করেছেন: খ্রীষ্ট যীশুতে *সুসমাচার দ্বারা আমিই তোমাদেরকে জন্ম দিয়েছি*। এই সুসমাচার অবশ্যই সত্যে পরিপূর্ণ বাক্য, নতুবা তা কখনোই এমন খাঁটি, দীর্ঘস্থায়ী ও মহান কাজ সাধন করতে পারত না। আমাদের উচিত এই সুসমাচারের উপরে নির্ভর করা এবং এরই আলোকে আমাদের আত্মার অনন্ত জীবন লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। সুসমাচারের কাছে আসলে আমাদের আত্মা ও অন্তরকে আমরা অবশ্যই পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলতে পারব, কারণ তা সত্যের বাক্য, ইউ ১৭:১৭।

(৪) আমাদের ঈশ্বরের পুনরুজ্জীবিতকারী অনুগ্রহ দানের উদ্দেশ্য এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে: *যেন আমরা তাঁর সৃষ্টবস্তুগুলোর মধ্যে এক রকম অগ্রিমাংশ হই*। যেন আমরা ঈশ্বরের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হই এবং তাঁর কাছে এক বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠি, যেভাবে যে কোন ফসলের অগ্রিমাংশ তাঁর জন্য বিশেষভাবে পৃথক করে রাখা হয়। যীশু খ্রীষ্ট হলেন খ্রীষ্ট -বিশ্বাসীদের অগ্রিমাংশ, আর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা হলেন সমগ্র সৃষ্টিপৃথিবীর অগ্রিমাংশ।

যাকোব ১:১৯-২৭ পদ

অধ্যায়ের এই অংশে আমাদের প্রতি যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:-

ক. আমরা যেন ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বশবর্তী সমস্ত কাজ ত্যাগ করি। কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি সত্যের বাক্য দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করি, তখনই কেবল আমরা তা শিখতে পারি। ধার্মিকতার কারণে কষ্টভোগ করার সময় আমাদের ভেতরে ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা জন্ম নিতে পারে, এবং তা থেকেই উৎপত্তি ঘটে আমাদের নিজ নিজ পাপ ও অন্যায়ের। সে কারণে এই ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতাকে শুরুতেই দমন করতে হবে। ঈশ্বরের পুনরুজ্জীবিতকারী অনুগ্রহ ও সুসমাচারের বাক্য ধারণ করে আমাদেরকে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে: *হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা প্রত্যেকে*

শুনবার জন্য আগ্রহী হও, কথাবার্তায় ধীর, ক্রোধে ধীর হও, পদ ১৯। এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছেঃ-

১. আমাদেরকে সত্যের বাক্য শোনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হতে হবে, যার সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী পদগুলোতে জেনেছি। সেই সূত্রে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ঈশ্বরের বাক্য শোনা এবং তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। আমাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা এবং মানবীয় মতধারা অনুসারে কথা বলা আমাদের পক্ষে অনুচিত। আমরা যেন কখনো এমন চিন্তা না করি যে, আমাদের পাপ ও অন্যায়ের জন্য ঈশ্বর দায়বদ্ধ, বা আমাদের কষ্টভোগের জন্য তিনিই দায়ী। বরং আমাদের উচিত সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করা এবং তাঁর শিক্ষা অনুধাবন করা।

২. অধ্যায়ের শুরুতে যে কষ্টভোগ ও পরীক্ষার কথা বলা হয়েছিল তার ক্ষেত্রে আমরা এই শিক্ষা প্রয়োগ করা যায়। এখানে লক্ষ্য করতে পারি, প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর পূর্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করছেন এবং তিনি আমাদের জন্য কী পরিকল্পনা করে রেখেছেন তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। এক্ষেত্রে আমাদের কোনভাবে উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হলে চলবে না। পরীক্ষার সময় ঈশ্বরকে দোষারোপ করার বদলে আমাদের উচিত হবে নিজ নিজ কান ও অন্তর খুলে সুসমাচারের বাক্য শ্রবণ করা এবং আমাদের জন্য ঈশ্বর যা বলেছেন তা শ্রবণ করা।

৩. এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তৎকালীন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের কষ্টভোগ ও পরীক্ষার মাঝে কী ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহের মধ্যে ভুগছিলেন। এ কারণে অধ্যায়ের এই অংশটিকে আমরা পূর্ববর্তী যে কোন অংশের সাথে সংযুক্ত না ভেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে যতই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হোক না কেন, প্রত্যেকের উচিত তার প্রতিপক্ষের কথা শোনা। মানুষ অনেক সময় নিজেদের ধারণায় অটল হয়ে থাকে, ফলে অন্যদের যে বক্তব্য রয়েছে তা তারা শুনতে চায় না। আমাদের উচিত প্রত্যেকের মতামত অকুণ্ঠভাবে শোনা এবং যা সত্য তা গ্রহণ করা। সেই সাথে আমাদের উচিত কথা বলার আগে ভেবে নেওয়া এবং তাতে অন্যের দুঃখ বা ক্রোধ উৎপন্ন হয় এমন কিছু না বলা। এই পত্রটির উদ্দেশ্য হচ্ছে তৎকালীন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যকার বিভিন্ন মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব নিরসন করা। এ কারণেই প্রেরিত যাকোব তাঁর এই পত্রটিতে বারবার নানাভাবে অনুরোধ করেছেন যেন বিশ্বাসীরা শোনার জন্য আগ্রহী, কথাবার্তায় ধীর এবং ক্রোধে ধীর হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি মানুষ তার জিহ্বা দমন করে, তাহলে তারা তাদের ইন্দ্রিয়কে দমন করতে সক্ষম হয়। যখন মোশিকে তাঁর আত্মা প্ররোচিত করেছিল, তখন তিনি তাঁর জিহ্বা দিয়ে চিন্তা ভাবনা না করেই কথা বলেছিলেন। যদি আমরা কথাবার্তায় ধীর হই, তাহলে আমরা ক্রোধেও ধীর হব।

খ. আমাদের ইন্দ্রিয় দমনের সপক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি এখানে প্রদর্শন করা হয়েছেঃ কারণ মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতা উৎপন্ন করে না, পদ ২০। এর মধ্য দিয়ে প্রেরিত যাকোব মূলত বোঝাতে চেয়েছেন, "মানুষ অনেক সময় ঈশ্বর ও তাঁর গৌরবের প্রতি

এতটাই আগ্রহী হয়ে পড়ে যে, তারা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু করে বসে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, মানুষের এ ধরনের ক্রোধ ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। ক্রোধ ও ভীতি সঞ্চারের বদলে নম্রতা ও ধীরস্থিরতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আরও সফলতার সাথে সাধিত হয়।" রাজা শলোমন বলেছেন, হীনবুদ্ধিদের মধ্যে কর্তৃত্বকারীর চিৎকারের চেয়ে জ্ঞানবানদের কথা শান্তিস্থানে বেশি শোনা হয়, উপদেশক ৯:১৭। ড. ম্যানটন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে যেমন সব সময় মুখিয়ে থাকি, তেমনটা যদি অন্যের কথা শোনার বেলায় হতাম, তাহলে আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসা অনেকাংশে হ্রাস পেত এবং আমরা খ্রীষ্টিয়ানরা সম্মিলিতভাবে আরও অগ্রগতি অর্জন করতে পারতাম।" ধর্মীয় মতবিরোধের মাঝে আমরা সবচেয়ে অপ্রীতিকর যে বিষয়টিকে আসার সুযোগ দিই তা হচ্ছে আমাদের ক্রোধ। আমরা মনে করি ন্যায় ও ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এই ক্রোধ। কিন্তু আসলে তা সঠিক নয়। এই ক্রোধ হচ্ছে মানবীয় বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের ক্রোধ সব সময়ই ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিরোধী। যারা মনে করে যে, তাদের ক্রোধের মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরেরই সেবা করছে, তারা যে আসলে ঈশ্বর বা তাঁর স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের জন্য তা করছে না সেটি এখানে প্রকাশ পায়। আমাদেরকে ক্রোধ তথা ইন্দ্রিয়কে দমন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে তখনই, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করব, ১ পিতর ২:১,২।

গ. আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে যেন আমরা ক্রোধের পাশাপাশি অন্যান্য মন্দ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করি: *তোমরা সকল অশুচিতা ও দুষ্টতার উচ্ছাস ফেলে দাও*, পদ ২১। এখানে অশুচিতা শব্দটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই সকল মন্দ অভিলাষ যা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ধরনের ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপ। অপরদিকে দুষ্টতা বলতে বোঝানো হয়েছে আত্মিক মন্দতা ও কলুষতা। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের জন্য এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, শুধুমাত্র দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য মানুষকে সচেষ্ট হলেই চলবে না, সেই সাথে তাকে রূহানিকভাবেও শুদ্ধতা অর্জন করতে হবে, অন্তরের সকল কলুষতা ও মন্দ চিন্তা-ভাবনা দূর করে ফেলতে হবে, যেগুলো ঈশ্বর একান্তভাবে ঘৃণা করেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. পাপ এক কলুষতাপূর্ণ বিষয়, যার নামেই প্রকাশ পায় মন্দতা ও ঘৃণা।

২. আমাদের ভেতরে যে মন্দতা রয়েছে তাকে পাপ বহু গুণ বাড়িয়ে তোলে।

৩. মন্দতা থেকে শুধুমাত্র সরে আসলেই চলবে না, বরং সেই সাথে আমাদের জীবন থেকে সেগুলোকে চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। নোংরা পোশাক যেমন আমরা ছুড়ে ফেলে দিই, সেভাবেই পাপ ও পাপ-স্বভাব আমাদের জীবন থেকে আলাদা করে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

৪. শুধুমাত্র বাহ্যিক পাপ নয়, বরং সেই সাথে চিন্তা ও কাজের এবং আমাদের সমস্ত কথাবার্তায় যে সকল পাপ প্রকাশ পায় তার সবই আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে; *pasan rhyparian* – সমস্ত মন্দতা, যা কিছু কলুষিত ও পাপপূর্ণ।

৫. আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, এই অধ্যায়ের শুরু থেকেই বলা হচ্ছে পরীক্ষার সময় আমাদেরকে অবশ্যই পাপ স্বভাব দূরে সরিয়ে দিতে হবে। উপরন্তু আমাদের কথায় ও কাজের সকল ভ্রান্তি এড়িয়ে চলার জন্য এবং সত্যের বাক্য সঠিকভাবে গ্রহণ ও চর্চার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পাপ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।

ঘ. ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করা সম্পর্কে আমাদেরকে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

১. আমাদের নিজেদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করতে হবে (পদ ২১), যেন আমরা সকল প্রকার পাপ স্বভাব থেকে মুক্ত হই এবং আমাদের অন্তরকে অন্ধ করে রাখে এমন সমস্ত মন্দতা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখি। সকল প্রকার অশুচিতা ও দুষ্টতার উচ্ছাস আমাদেরকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। আর এর মধ্য দিয়েই আমরা সুসমাচারের বাক্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে সক্ষম হব।

২. কীভাবে আমরা সুসমাচার শ্রবণ করব সে সম্পর্কে আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া: *মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে।*

(১) ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করার অর্থ হল তা আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করা, এর সত্য অনুধাবন করা, এর বিধানের প্রতি সম্মত হওয়া। এই বাক্য আমাদেরকে এএভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন তা চিরকালের জন্য আমাদের হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। গাছে যেভাবে কলম করা হয়, সেভাবে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের অন্তরে রোপণ করতে হবে, যেন আমাদের নিজেদের ফল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের ফল আমাদের আত্মার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

(২) এ কারণে আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নম্রতায় ও কৃতজ্ঞতার সাথে সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ করতে হবে: *মৃদুভাবে গ্রহণ কর*। আমাদের ভুলগুলো যদি আমরা শুনি, উপলব্ধি করি এবং ধৈর্যের সাথে তা সংশোধনের চেষ্টা করি, তাহলেই কেবল আমরা সুসমাচারের বাক্য অন্তরে ধারণ করতে সক্ষম হব।

(৩) সুসমাচার শ্রবণের সময় আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের আত্মার পরিত্রাণ সাধনের জন্য লক্ষ্য স্থির করা। ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে পরিত্রাণ সম্পর্কে আরও প্রজ্ঞাবান করে তোলা। যারা পরিত্রাণকে কোনভাবে অবজ্ঞা করে তারা সুসমাচারকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের আত্মার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ ও পাঠ করার জন্য এর কাছে আসা, কারণ আমরা জানি যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বর পরিত্রাণ দান করেন, রোমীয় ১:১৬।

৩. আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে, শ্রবণ করার পর আমাদের কী করা উচিত (পদ ২২): আর বাক্যের কার্যকারী হও, নিজেদেরকে ভুলিয়ে শ্রোতামাত্র হয়ো না। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) আমরা কোন কিছু করার আগে শুনি। কাজেই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করা হলেও তা আমাদের কোন উপকারে আসবে না যদি আমরা সে অনুসারে কাজ

না করি। যদি আমরা সপ্তাহের প্রত্যেকটি দিন প্রচার প্রচার শুনি এবং স্বর্গে থেকে কোন স্বর্গদূত নেমে এসে সেই বাণী-প্রচার করেন, তথাপি সেই বাণী-প্রচার আমাদের জীবনের জন্য এতটুকু প্রভাব বয়ে আনবে না, যদি আমরা সেই বাণীর আলোকে নিজেদের জীবনকে নতুন করে না সাজাই। এ কারণে প্রেরিত যাকোব বিশেষভাবে বলছেন যে, আমাদেরকে আমরা যা শুনি তা যেন চর্চা করি। "আমাদেরকে ধ্যানের মধ্য দিয়ে আত্মিক চর্চা ও আন্তরিক বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বাহ্যিক চর্চা করতে হবে," – *ব্যাক্সটার*। আমরা যা শুনি তা মনে রাখা, তা পুনরায় মুখ দিয়ে বলা, সাক্ষ্য দেওয়া, তার প্রশংসা করা, তা লিখে রাখা এবং সংরক্ষণ করাটাই যথেষ্ট নয়। ধার্মিকতার মুকুট জিততে হলে আমাদেরকে সুসমাচারের বাক্য অনুসারে কাজ করতে হবে।

(২) যারা শুধু শুনেই যায়, তারা নিজেদের সাথে প্রবঞ্চণা করে। এ ধরনের লোকদেরকে বলা হয়েছে *paralogizomenoi*, অর্থাৎ যারা নিজেদের অন্তরের সাথে প্রতারণা করে ও উত্তম কোন কিছু থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। এ ধরনের লোকেরা কথায় বিশ্বাসী, কাজে নয়। তারা তাদের কাজে ভার নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। ফলে সুসমাচারের বাক্য হাজারবার শ্রবণ করার পরও তাদের দ্বারা তা কখনোই বাস্তবায়িত হয় না। তাদের মধ্যে কোন লক্ষ্য বা প্রত্যয় থাকে না এবং তাদের জীবন হয় ফলহীন।

৪. প্রেরিত যাকোব দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক প্রয়োগ কোনটি, কারা সঠিকভাবে এই বাক্যের প্রয়োগ ঘটায় না এবং কারা সঠিকভাবে তা ব্যবহার করে, পদ ২৩ -২৫। এই প্রত্যেকটি বিষয় আমরা পৃথকভাবে দেখব।

(১) আয়নার সাথে তুলনা করলে আমরা সবচেয়ে ভাল করে বুঝতে পারব যে, ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের কীভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। আয়নায় মানুষ তার সঠিক বাহ্যিক চেহারা দেখতে পারে। আয়নায় যেমন একজন মানুষের মুখের সমস্ত দাগ ও ময়লা স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং এর সাহায্যে সেগুলো খুব সহজে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলা যায়, ঠিক তেমনি করে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পাপগুলোকে স্পষ্ট করে উপস্থাপন করে, যেন আমরা সে সকল পাপের জন্য অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করি এবং ক্ষমা লাভ করতে পারি। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি কোথায় কোথায় আমাদের ভুল ভ্রান্তি রয়েছে এবং আমাদের কী কী বিষয় সংশোধন করা প্রয়োজন। এমন অনেক আয়না রয়েছে যা মানুষের প্রকৃত চেহারা লুকিয়ে অনেক বেশি চাকচিক্য প্রকাশ করে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কখনো অসত্য কোন কিছু প্রকাশ করে না। মানুষের প্রকৃত রূপকে তা প্রকাশ করে। সত্যের বাক্য সঠিকভাবে গ্রহণ করা হলে তা আমাদের স্বভাবগত সমস্ত কলুষতা, সকল পাপ ও অপরাধ, আমাদের চিন্তা ও মননের সকল অস্থিরতা প্রকাশ করে দেয় এবং আমরা আসলে কেমন তা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে। পৌল বলেছেন, তিনি যত দিন না ব্যবস্থার আয়না দিয়ে নিজেকে দেখেছেন, তত দিন তিনি তার নিজ পাপ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন (রোমীয় ৭:৯): *আমি এক সময়ে ব্যবস্থা ছাড়া জীবিত ছিলাম*। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি নিজেকে ধার্মিক বলে ভাবতেন এবং তাঁর যে কোন পাপ থাকতে পারে তা তিনি ধর্তব্যেই আনতেন না। তাঁর বিবেক কখনো তাঁকে দংশ করতো না। *কিন্তু সেই আদেশ আসলে পর*, অর্থাৎ ব্যবস্থার

আয়না সামনে এসে দাঁড়ানোর পর *পাপ জীবিত হয়ে উঠল, আর আমি মরলাম*। ব্যবস্থা তথা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও অনুধাবনের মধ্য দিয়ে পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোথায় কোথায় তাঁর কালিমা ও কলুষতা আছে। তিনি তাঁর জীবনের কালো দিকটি উদঘাটন করতে সক্ষম হলেন, যার সম্পর্কে তাঁর আগে কোন ধারণাই ছিল না। আমরা যখন সুসমাচারের কাছে আসি, তখন আমরা আমাদের স্বরূপ দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি যে, আমরা আসলে কতটুকু পাপের আবর্তে ডুবে আছি।

(২) যারা বাক্যের আয়না ব্যবহার করে না তাদের সম্পর্কে এখানে আমরা কিছু কথা দেখতে পাইঃ সে নিজেকে দেখলো, চলে গেল আর সে কীরূপ লোক, তা তখনই ভুলে গেল, পদ ২৪। যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু সে অনুসারে কাজ করে না এমন ব্যক্তির এটাই প্রকৃত চিত্র। এমন অনেকে আছে যারা বাক্য শুনতে অভ্যস্ত এবং একই সাথে তারা নিজেদের পাপ, দুর্দশা ও বিপন্নতায় জর্জরিত। তারা তাদের নিজেদের পাপসমূহ জানে এবং তাদের জীবনে খ্রীষ্টের অভাবও তারা অনুভব করে। কিন্তু যখন তাদের বাক্য শোনা শেষ হয়, তখন তারা সব কিছু ভুলে যায় এবং বানভাসি উপকূলের মত তাদের অন্তরে থেকেও সেই অপরাধবোধ একেবারে ধুয়ে মুছে যায়। ড. ম্যানটন বলেছেন, “আমরা আমাদের পাপগুলোকে কীভাবে এড়িয়ে চলতে পারি এবং কীভাবে যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতা অনুসারে আমাদের আত্মাকে নতুন রূপ দান করতে পারি সে সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে শেখায়। আমাদের পাপকে ধরেই ব্যবস্থার বিধানগুলো আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টের রক্তের মাঝেই সুসমাচারের কার্যকারিতা নিহিত।” কিন্তু আমরা বৃথাই ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করি এবং সুসমাচারের আয়নার দৃষ্টি দিই, যদি আমরা আমাদের কালিমাগুলোকে পরিষ্কার না করে সেগুলোকে ভুলে থাকি এবং যদি সুসমাচারের বাক্য প্রয়োগ না করে সেগুলো উপেক্ষা করি।

(৩) যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং তা আয়নার মত করে যেভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করে, তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে। তাদের সম্পর্কে এই অংশে বলা হয়েছে (পদ ২৫): *যে কেউ হেঁট হয়ে ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে . . . নিজের কাজে ধন্য হবে*। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] সুসমাচার হচ্ছে মুক্তির বিধান। মি. ব্যাক্সটারের মতে আমাদের জন্য এ এক স্বাধীনতা, যা আমাদেরকে যিহূদী ব্যবস্থা, পাপ ও অপরাধবোধ, এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করে। ব্যবস্থী বিধান ছিল আমাদের জন্য এক বন্দীত্বের জোঁয়ালি; খ্রীষ্টের সুসমাচার হচ্ছে স্বাধীনতার বিধান।

[২] এটি একটি নিখুঁত আইন; এর সাথে আর কোন কিছু যোগ করার নেই।

[৩] সুসমাচার শব্দটি স্বয়ং প্রকাশ করে এক নিখুঁত বিধানের কথা। আমরা আমাদের জীবন পথে চলার জন্য দিক-নির্দেশনা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য তা পাঠ করে থাকি। আমরা সুসমাচারে দৃষ্টিপাত করি যেন এর থেকে আমরা আমাদের পদক্ষেপগুলো কী হবে তা

নির্ধারণ করতে পারি।

[৪] আমাদের জীবনে এই সুসমাচার তখনই সফলতা লাভ করবে যখন আমরা তা ভক্তি সহকারে অধ্যয়ন করব, তা মনে প্রাণে ধ্যান করব, সব সময় তা আমাদের দিক-নির্দেশক হিসেবে চোখের সামনে রাখব, তা আমাদের কথাবার্তায় ও আচরণের আদর্শ করে নেব এবং আমাদের ইন্দ্রিয় দমনের জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করব।

[৫] যারা এভাবে সুসমাচার অন্তরে ধারণ করে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও বাক্যের অনুসারী হয়, তারা তাদের সকল কাজে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। অনেকের মতে এখানে যাকোব গীতসংহিতা ১ অধ্যায়ের প্রথম পদটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন: *যে ভুলে যাবার শ্রোতা না হয়ে কার্যকারী হয়, সে নিজের কাজে ধন্য হবে*। এখানে প্রেরিত যাকোব সরাসরি এ কথা বলেন নি যে, মানুষ তার কাজের জন্যই আশীর্বাদ লাভ করবে। বরং মানুষ তার বিশ্বাসের ফলস্বরূপ যে কাজ করবে, সেই কাজের মধ্য দিয়ে সে আশীর্বাদ লাভ করবে। ঈশ্বরের বাক্য জানা নয়, বরং তা বিশ্বাস সহকারে পালন করার মাঝেই আশীর্বাদ নিহিত রয়েছে। ইউ ১৩:১৭ পদে বলা হয়েছে, *এসব যখন তোমরা জানো, ধন্য তোমরা, যদি এসব পালন কর*। কথা বলে নয়, বরং পথ অতিক্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বর্গের রাস্তায় এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ঙ. এরপরে প্রেরিত যাকোব আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, কীভাবে আমরা একটি অসার ধর্ম থেকে ঈশ্বরের সত্য ধর্মকে পৃথক করতে পারি। এই বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে: কোন ধর্মটি মিথ্যা ও অসার এবং কোন ধর্মটি সত্য ও খাঁটি। আমি খুব খুশি হতাম যদি সমস্ত মানুষ পবিত্র শাস্ত্রে এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করতো। এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর ঘোষণা করা হয়েছে:-

১. অসার ধর্ম কী: *যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, আর নিজের জিহ্বাকে বলগা দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু নিজের হৃদয়কে ভুলায় তার ধর্ম মিথ্যা*। এখানে তিনটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

(১) একটি অসার ধর্মে অনেক বেশি প্রদর্শনী চলে, যেন সমস্ত কার্যকলাপ অন্যদের চোখে ধার্মিকতার কাজ বলে মনে হয়। আমার মতে এখানে *মনে করে* কথাটির উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন তার ধার্মিকতার প্রকৃত মাত্রা ছাড়িয়ে বেশি বেশি দেখানোর চেষ্টা করে, তখন তার ধর্ম অসার বলে প্রকাশ পায়। এমন নয় যে, সেই ধর্মটির অসার। কিন্তু মানুষ তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এতটা বড় করে দেখায় যে, সেখানে আসলে খোদায়ী কোন সত্তার কোন অস্তিত্বই আর থাকে না, বরং পুরোটাই মানবীয় হয়ে পড়ে।

(২) অসার ধর্মে অনুসারীদের পরস্পরের প্রতি সমালোচনা, তিরস্কার ও মনোমালিন্য বেশি থাকে। এখানে তাদের জিহ্বাকে বলগা দ্বারা বশে রাখা বলতে বোঝানো হয়েছে অন্যদের প্রতি নেতিবাচক কথা বলা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে। যখন আমরা শুনি একজন মানুষ

অন্য কারও ভুলগুলো সম্পর্কে বলছে বা অন্যদের কাজ নিয়ে সমালোচনা করছে, বা কারও নির্বুদ্ধিতা নিয়ে তিরস্কার করছে, তখন তারা আসলে নিজেদেরকে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে জাহির করতে চায়। আর এটাই তাদের মধ্যকার অসার ধর্মের চিহ্ন। যে মানুষের জিহ্বা সমালোচনাকারী, তার মাঝে কখনো সত্যিকার নম্র ও অনুগ্রহপূর্ণ অন্তর থাকতে পারে না। যে মানুষ তার কথা দিয়ে প্রতিবেশীকে দুঃখ দেয়, সে ঈশ্বরকে কখনোই ভালবাসতে পারে না।

(৩) অসার ধর্মে মানুষ তার নিজ আত্মাকে ধোঁকা দেয়। সে এমন ভাবে চলে যার ফলে সে অন্যদের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে এবং হামবড়া ভাব দেখায়। তার নিজ আত্মার প্রবঞ্চণার মধ্য দিয়ে সে তার ধর্মের অসারতা প্রকাশ করে।

২. খাঁটি ধর্মের অবস্থান কোথায় তা এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এবং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বিশেষ কাজ ও দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে যে ধর্ম রক্ষা করা হয়, সেটাই *পিতা ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ও বিমল ধর্ম*, পদ ২৭। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) খাঁটি ও পবিত্র হওয়াটা একটি ধর্মের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এমন ধর্ম কখনো মানুষের হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয় না বা এই পৃথিবীর কলুষতার ছাপ তাতে পড়ে না। মিথ্যা ধর্ম সেগুলোর অশুদ্ধতা ও ভালবাসাহীনতা থেকে চেনা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রেরিত যোহন বলেছেন, *যে ব্যক্তি আপন ভাইকে ভাল না বাসে, সে ঈশ্বরের লোক নয়*, ১ যোহন ৩:১০। কিন্তু অপরদিকে একটি পবিত্র জীবন এবং ভালবাসায় পূর্ণ একটি হৃদয় থেকে খাঁটি ধর্ম প্রকাশিত হয়। আমাদের ধর্ম বাহ্যিক ধার্মিকতা ও উৎসব পালনে প্রকাশ পায় না, বরং তা প্রকাশ পায় আত্মার শুদ্ধতা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে। যে ধর্ম উৎসগতভাবে খাঁটি ও পবিত্র, তা কখনো মানুষের কারণে কলুষিত হতে পারে না।

(২) ঈশ্বর ও পিতার কাছে আমাদের ধর্ম খাঁটি ও বিশুদ্ধ। ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের প্রতিটি কাজে, কথায় ও আমাদের বিশ্বাসে ধর্মের সেই শুদ্ধতা ধরে রাখি। খাঁটি ধর্ম আমাদেরকে শেখায় সমস্ত কাজ এএভাবে করতে, যেন তা আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের সামনেই করছি। আমাদেরকে সব সময় তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে হবে এবং আমাদের সকল কাজে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

(৩) খাঁটি ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ অংশ হচ্ছে দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালবাসা প্রকাশ: *দুঃখ-কষ্টের সময় এতিমদের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা*। এখানে তত্ত্বাবধান করা বলতে বোঝানো হয়েছে আমাদের সামর্থ্য অনুসারে তাদের অভাব মেটানোর জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করা। এতিম ও বিধবদের কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ সমাজে তারাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও বঞ্চিত। কিন্তু এখানে আসলে সমাজের সমস্ত দুঃখী ও দরিদ্র মানুষকেই পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়েছে। এখান থেকে আমরা খাঁটি ধর্মের দুটি বিশেষ দায়িত্বের কথা জানতে পারি – ভালবাসা এবং দান করা।

(৪) অকৃত্রিম ভালবাসা ও দানের পাশাপাশি অবশ্যই নিষ্কলঙ্ক জীবন-যাপন করতে হবে:

নিজেকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা। এই পৃথিবী আমাদের আত্মাকে কলঙ্কিত ও কলুষতাময় করে তোলার জন্য বদ্ধ পরিকর। সে কারণে এই পৃথিবী বাস করেও নিজেকে মন্দতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কিন্তু এটাই হওয়া উচিত আমাদের সার্বক্ষণিক লক্ষ্য। এখানেই নিহিত থাকে খাঁটি ও বিশুদ্ধ ধর্ম। অতি মাত্রার পার্থিব বিষয়গুলো আমাদের আত্মাকে করে তোলে চঞ্চল, ফলে আমাদের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা হয়ে পড়ে নড়বড়ে। পৃথিবীর পাপ ও অভিলাষ আমাদেরকে পেয়ে বসে এবং আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। এ জন্য যোহন পৃথিবীর সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তুকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন: পাপ-স্বভাবের অভিলাষ, চোখের অভিলাষ এবং সাংসারিক অহঙ্কার। তিনি আমাদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন আমরা নিজেদেরকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য এই সকল পার্থিব মন্দতা এড়িয়ে চলি। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের অন্তর ও আমাদের জীবনকে এই পৃথিবীর প্রতি মোহ থেকে মুক্ত করুন এবং পার্থিব মানুষের শত প্রলোভন থেকে আমাদেরকে সুরক্ষা দিন।

যাকোবের লেখা পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে প্রেরিত যাকোব ধন সম্পদ নিয়ে পাপ করা ও দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করার বিষয়ে কথা বলেছেন। ঈশ্বর যে দরিদ্রদেরকে ভালবেসেছেন তাদের প্রতি অবিচার করা এবং তাঁর নামের নিন্দা করাকে যাকোব পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায় বলে মত দিয়েছেন এবং ঈশ্বরের বিরোধিতাপূর্ণ একটি কাজ বলে রায় দিয়েছেন, পদ ১-৭ পদ। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বিধান সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে এবং ন্যায় বিচারের পাশাপাশি করুণাও করতে হবে, পদ ৮-১৩। তিনি সেই সমস্ত মানুষের মূর্খতা ও ভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করেছেন, যাদের বিশ্বাস কর্মবিহীন। তিনি আমাদেরকে বলছেন যে, এ ধরনের বিশ্বাস মৃত। পিতা অব্রাহাম বা রাহবের মধ্যে যে বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বাস তা নয়; বরং এই বিশ্বাস একান্তভাবে শয়তানের বিশ্বাস, পদ ১১-২৬।

যাকোব ২:১-৭ পদ

এখানে প্রেরিত যাকোব অত্যন্ত গুরুতর একটি অপরাধের তিরস্কার করছেন। তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে, *ঢ়ৎড়ংড়ঢ়ড়ষবঢ়ংরধ* বা পক্ষপাতিত্বের কারণে মানুষ কী ধরনের পাপে পতিত হয়, কীভাবে এই পক্ষপাতিত্ব প্রথম যুগে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে দুষ্টক্ষতের মত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরবর্তীতে তা খ্রীষ্টিয় জাতি ও সমাজকে দুঃখজনকভাবে বিভক্ত করে দেয়। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এই পাপ সম্পর্কে সার্বজনীনভাবে সাবধান করা হয়েছে: *হে আমার ভাইয়েরা, আমাদের যীশু খ্রীষ্টের উপর – মহিমাময় প্রভুর উপর – তোমাদের যে বিশ্বাস তা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না* হয়, পদ ১। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. খ্রীষ্টানদের কাঙ্ক্ষিত চরিত্র এখানে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: খ্রীষ্টিয়ানরা এমন মানুষ, যাদের মাঝে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস নিহিত রয়েছে। তারা এই বিশ্বাস ধারণ করে, তা গ্রহণ করে, এর দ্বারা তারা পরিচালিত হয়, তারা এই বিশ্বাসের নির্দেশনায় আনন্দ সহকারে জীবন ধারণ করে এবং খ্রীষ্টের বিধান ও তত্ত্বাবধানের অধীনে

নিজেদেরকে সমর্পণ করে।

২. যাকোব অত্যন্ত সম্মানসূচক ভঙ্গিতে যীশু খ্রীষ্টের কথা বলছেন। তিনি তাঁকে মহিমাময় প্রভু বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ তিনি তাঁর পিতার মহিমার উজ্জ্বলতা এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি।

৩. খ্রীষ্টকে মহিমাময় বলে আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যতীত অন্য আর কিছুর ভিত্তিতে যেন আমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে মূল্যায়ন না করি। আমরা যারা আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করি, তাদের মধ্যে পার্থিব সম্পদের ভিত্তিতে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয়। আমাদের উচিত মানুষের ধন সম্পদের হিসাব না করে, কে গরীব আর কে ধনী তা না দেখে আত্মার বিচার করা। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরব ও মহিমা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের কোন অবস্থাতেই কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কারও সাথে আপোষ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যদি আমরা কোন মানুষের মুখাপেক্ষা করি তাহলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. এই পাপ সম্পর্কে এখানে উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, পদ ২,৩। পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশে সমাজঘর বলতে বোঝানো হয়েছে এমন একটি সমাগম স্থল যেখানে মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত, বা কোন অপরাধের বিচার করা হত। এ কারণে এখানে গ্রীক অনুলিপিতে *synagoge* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা যিহূদীদের সমাজঘর বুঝিয়ে থাকে। ম্যায়মোনায়েডস (Maimonides) বলেন, " যিহূদীদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, একজন দরিদ্র ও একজন ধনী ব্যক্তি যখন এক সাথে কোন বিচারের জন্য আসবে, তখন ধনী ব্যক্তিকে বসতে বলে দরিদ্র ব্যক্তিটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা বা আরও নিচু কোন স্থানে বসতে বলা যাবে না, বরং উভয়কে সম মর্যাদা সম্পন্ন আসনে বসাতে হবে।" কাজেই এই অংশে প্রেরিত যাকোব অত্যন্ত সহজ ও সরল একটি সত্য প্রকাশ করেছেন। যিহূদীদের মতই খ্রীষ্টানদের নিজস্ব সমাজঘর ছিল, যেখানে ধর্মীয় আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হত। সেখানে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হত ও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা হত। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. প্রত্যেক শ্রেণী-পেশার মানুষের মাঝে ঈশ্বরের নিজের লোকেরা রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন ও জীর্ণ পোশাক পরে এবং তাদের পার্থিব ধন সম্পদ নেই।

২. ধর্ম পালন ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের কোন ব্যবধান নেই, তারা উভয়েই এক কাতারে দাঁড়াবে। মানুষের ধন-সম্পদ তাকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয় না, আবার মানুষের দারিদ্র তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয় না। ঈশ্বর কারও মুখাপেক্ষা করেন না, তাই আমাদেরও কারও সাথে পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়।

৩. খ্রীষ্টিয় সমাজে পার্থিব প্রতিপত্তি ও সম্পদের ভিত্তিতে মানুষকে সম্মান করার বিপক্ষে

বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাকোব এখানে কর্কশ আচরণ বা বিশৃঙ্খলাকে উসকে দিচ্ছেন না। আমাদেরকে অবশ্যই সমাজের প্রত্যেকটির মানুষের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু এই সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে সীমা মেনে চলতে হবে, যেন মণ্ডলীতে ধার্মিকতা বজায় থাকে। সিয়োনের নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে সব সময় এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, মন্দ ব্যক্তি আমাদের চোখে ত্যাজ্যনীয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে সে আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র। যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি ভাল মানুষ হয়, তাহলে তার দারিদ্রের জন্য তাকে আমরা সম্মানিত করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতে পারি না। আবার যদি কোন ধনী ব্যক্তি মানুষ হিসেবে মন্দ হয়ে থাকে, তার শরীরে যদি খুব জমকালো কোন পোশাক থাকে এবং আ-কাশছোঁয়া ধন-সম্পত্তি থেকে থাকে, তারপরও আমাদের উচিত নয় তার এই সকল পার্থিব সম্পদ ও প্রতিপত্তির জন্য তাকে কোন বাড়তি সম্মান বা মনোযোগ দেওয়া।

গ. এখানে আমরা দেখি এই পাপ কতটা গুরুতর, পদ ৪,৫। মুখাপেক্ষা বা পক্ষপাতিত্ব করা অন্যায় ও অনৈতিক। এর দ্বারা আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে স্থাপন করি, যিনি দরিদ্রদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং তাদেরকে যিনি সম্মানিত করেন ও উন্নত করেন।

১. এই পাপে রয়েছে লজ্জাজনক পক্ষপাতিত্ব: *আমরা কি তাহলে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ করছি না?* এখানে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছে তা প্রত্যেক মানুষের বিবেকের জন্য করা হয়েছে, যেন প্রত্যেকে নিজেকে যাচাই করে দেখে। আমরা কি সত্যিই নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ বা পক্ষপাতিত্ব করি না? সেই ভেদাভেদ করতে গিয়ে আমরা কি মিথ্যা ধারণা বা নীতির বশবর্তী হচ্ছি না এবং সেই মিথ্যার দ্বারা চালিত হচ্ছি না? এই পক্ষপাতিত্ব কি আমাদেরকে ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করছে না? আমাদের বিবেক কি আমাদেরকে বলে না যে, আমরা অপরাধী? আমরা যদি শত ধার্মিকতা রক্ষা করে চলি, কিন্তু কারও না কারও ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করি, তাহলে আমাদের ধার্মিকতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

২. মানুষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তায় ও মননে মন্দতা ও অন্যায্যতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মন্দতার কারণে যেমন মানুষের চিন্তা-চেতনা, মানসিক অবস্থা ও কাজ কলুষিত হয়, ঠিক সেভাবেই মন্দতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মানুষ অন্যদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে: আমরা মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারকর্তা হয়ে পড়ি। অর্থাৎ, আমরা এই সকল মন্দ চিন্তাধারা ও অসৎ বিবেচনাবোধ নিয়ে মানুষকে বিচার করি। আমরা যে পর্যন্ত না আমাদের পক্ষপাতিত্বের প্রতি মদদ দেওয়া অন্তর্হিত চিন্তার ধারা খুঁজে পাই, সে পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই তা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমরা দেখব যে, সেসব চিন্তা অত্যন্ত মন্দ। আমরা গোপনে আত্মিক অনুগ্রহের বদলে বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে থাকি এবং যেসব জিনিস দেখা যায় না সেগুলোর বদলে যেগুলো দেখা যায় সেগুলোকে পছন্দ করে থাকি। আমাদের মন্দ সুপ্ত চিন্তাভাবনাগুলো প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের অন্তরের বিকৃত পাপগুলোকে কখনোই স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। ফলে আমাদের জীবনে আমাদের নিজেদের অপরিণামদর্শী কাজের ফলাফল আরও মন্দ হয়ে দেখা দেয়, কারণ আমাদের অন্তরের চিন্তার কল্পনা মন্দ, আদিপুস্তক ৬:৫।

৩. মানুষের প্রতি এভাবে পক্ষপাতিত্ব করে সম্মান প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুতর পাপ, কারণ এর ফলে আমরা নিজেদেরকে সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করি (পদ ৫,৬): "সংসারে যারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাদেরকে মনোনীত করেন নি? কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অসম্মান করেছ।" মানুষ সাধারণত যাদেরকে কোন মূল্য দেয় না, বা কোন ধরনের সম্মান দেখায় না, তাদেরকেই ঈশ্বর স্বর্গের উত্তরাধিকারী করেছেন এবং মহিমান্বিত প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাদের বাহ্যিক রূপ এতটাই অনাকর্ষণীয় যে, আমরা অনেক সময় তাদের দিকে ফিরেও তাকাই না। আমরা যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করি এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করি, তাদের জন্য কি এই বিষয়টি এক মারাত্মক অন্যায্য কাজ নয়? আমাদের চলার পথে সব সময় একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। আমরা যত দরিদ্রকে দেখব এই পৃথিবীতে, তারা সকলেই ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত। তাদের দারিদ্র কোন মতেই এই নির্বাচনকে ব্যাহত করতে পারে না। মথি ১১:৫ পদে বলা হয়েছে দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার কথা। ঈশ্বর মানুষের ভালবাসা ও অন্তরের ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্র ধর্ম পালন করতে শিক্ষা দিয়েছেন, কোন বাহ্যিক জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে নয়। এ কারণেই তিনি বেছে নিয়েছেন পৃথিবীর সকল দরিদ্রদেরকে। আবারও আমরা এমনটা দেখি যে, এই পৃথিবীর অনেক দরিদ্র ব্যক্তিই বিশ্বাসের দিক থেকে অত্যন্ত ধনী। এভাবেই সবচেয়ে দরিদ্র মানুষটি হয়ে ওঠে সবচেয়ে ধনী। আর এই ধন অর্জনের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। যাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ও প্রাচুর্য রয়েছে, তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা খুব স্বাভাবিক যে, তারা যেন ভাল কাজেও ধনী হয়। কারণ যার যত বেশি সম্পদ রয়েছে তার তত বেশি দান ও ভাল কাজ করা উচিত। অপরদিকে এই পৃথিবীতে সম্পদের দিক থেকে যারা দরিদ্র তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তারা যেন বিশ্বাসে ধনী হয়। কারণ তাদের ধন যত কম থাকবে, তাদের কাছ থেকে তত বেশি বিশ্বাস আশা করা হবে। তাই তাদের সব সময় আরও মহৎ এক পৃথিবীতে জীবন কাটানো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ্বাসে দিন যাপন করা উচিত। আমরা যদি আরও লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের নামের দিক থেকে ধনী, কারণ তারা প্রত্যেকেই স্বর্গীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী। যদিও তারা হয়তো এই পৃথিবীতে খুব দরিদ্র অবস্থায় দিন যাপন করছেন, কিন্তু তারা এই পৃথিবীর পরে এমন এক ধন লাভ করবেন যা অবর্ণনীয় আনন্দের ও সুখের। যখন কেউ বিশ্বাসে ধনী হয়, তখন তার মাঝে বিরাজ করে স্বর্গীয় ভালবাসা। ভালবাসা দ্বারা যে বিশ্বাস চালিত হয় তা স্বর্গীয় গৌরবের প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জীবনে বিরাজ করে। আরেকবার লক্ষ্য করুন, স্বর্গ হচ্ছে একটি রাজ্য। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের জন্য এই রাজ্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকৃত মুকুটের কথা আমরা বিগত অধ্যায়ে পাঠ করেছি, যাকোব ১:১২। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি রাজ্যও আমাদের জন্য রয়েছে। সেই মুকুট যেমন জীবনের মুকুট, তেমনি এই রাজ্যও হবে অনন্ত জীবনের রাজ্য। এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা এক সাথে ধরে বিচার করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এই পৃথিবীতে যে সকল দরিদ্র মানুষ বিশ্বাসে অত্যন্ত উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তারা ঈশ্বরের কাছে কতটা সম্মানিত হবেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে কতটা মর্যাদাপূর্ণ ও সুউচ্চ অবস্থান দান

করবেন। এ কারণে তাদেরকে দরিদ্র বলে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজ। এ ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনা করার পর আমাদেরকে এই বিষয়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে: *কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অসম্মান করেছ*, পদ ৬। মানুষকে তার পার্থিব সম্পদশালীতার বিচারে সম্মান করলে, অর্থাৎ ধনী ব্যক্তির প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর তা অত্যন্ত মারাত্মক পাপ হিসেবে বিবেচনা করবেন। কারণ সকল প্রকার পাপের মূল হচ্ছে পার্থিব ধন সম্পদের মোহ। এই ধন সম্পদের মোহের ফাঁদে পড়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের সত্তাকে বিসর্জন দেয় এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করে: *ধনবানেরাই কি তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে না? তারাই কি তোমাদেরকে টেনে নিয়ে বিচার-স্থানে যায় না? যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্তিত হয়েছে, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না?* পদ ৭। দেখুন, পৃথিবীর ধন সম্পদ কতভাবেই না মন্দতা ও পাপের জন্ম দেয়, ঈশ্বরের নিন্দা করতে ও দরিদ্রদেরকে নিপীড়ন করতে মানুষকে প্ররোচণা যোগায়। আমরা চিন্তা করলে দেখব, বহুবার মানুষের সম্পদ, ক্ষমতা ও পার্থিব প্রতিপত্তির কারণে আমাদের ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি কটুবাক্য নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং আমাদের উপর দিয়ে কত না অত্যাচার-অবিচারের পীড়ন চলেছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের পাপে বন্দী হয়েছি এবং যে নামের জন্য আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে সেই নামকে আমরা অসম্মানিত করেছি। খ্রীষ্টের নাম অত্যন্ত মহান এক নাম। এই নাম বিশ্বাসী হিসেবে খ্রীষ্টানদের সম্মানকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু যারা সেই সম্মানের যোগ্য, তারাই কেবল সেই আহ্বান লাভ করবে।

যাকোব ২:৮-১৩ পদ

যারা ধন সম্পদের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করে ও সম্মান দেয়, তাদেরকে প্রেরিত যাকোব অভিযুক্ত করেছেন এবং এই মন্দতার ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যা বলা প্রয়োজন তা তিনি বলেছেন। এখন তিনি আমাদেরকে বলছেন কী করে এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা মানুষকে শুধু ভর্ৎসনা ও সতর্কই করেন না, সেই সাথে তারা শিক্ষা ও নির্দেশনা দেন, কল ১:২৮। তারা প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করেন এবং প্রত্যেককে শিক্ষা দেন। এখানে আমরা দেখি:-

ক. আমাদের কাছে সেই ব্যবস্থা বা আইন রয়েছে যা আমাদেরকে সকল মানুষের প্রতি সমমর্যাদা পোষণ করতে নির্দেশনা দেয়। *"তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করো," পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা অনুসারে যদি তোমরা রাজকীয় ব্যবস্থা পালন কর, তবে ভাল করছো*, পদ ৮। পাছে কেউ মনে করে যে, যাকোব দরিদ্রদের প্রতি বেশি পক্ষ টানছেন এবং ধনীদেরকে এক তরফা দোষারোপ করে যাচ্ছেন, তা খণ্ডানোর জন্য এখন তিনি তাদেরকে তাঁর এই সকল বক্তব্যের মূল অর্থ ব্যাখ্যা করছেন। কারও প্রতি বিরোধিতা প্রদর্শন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর মূল শিক্ষা হচ্ছে, ধনীদের প্রতি কারও রূঢ় আচরণ করা উচিত নয়, আবার দরিদ্রদেরকেও কখনো অবজ্ঞা করা উচিত নয়। বরং পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা

অনুসারে আমাদের উচিত আমাদের সকল প্রতিবেশীকে সমানভাবে ভালবাসা। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যে বিধান অনুসরণ করে চলবেন তা পবিত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: পবিত্র শাস্ত্রের কথা অনুসারে। কোন মহান ব্যক্তি, কোন পার্থিব সম্পদ, ভণ্ড শিক্ষকদের কোন পাপপূর্ণ কাজ আমাদেরকে নির্দেশনা দিতে পারে না, যা পারে একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রের সত্য।

২. পবিত্র শাস্ত্র এখানে আমাদের নিজেদের মত করে প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসার কথা বিধান হিসেবে উপস্থাপন করছে। চূড়ান্তভাবে এই আদেশটিই আমাদের জন্য শিরোধার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য এই আদেশটিকে অবশ্য পালনীয় হিসেবে অত্যন্ত উঁচু অবস্থানে স্থাপন করেছেন।

৩. এই বিধান বা ব্যবস্থা এক রাজকীয় ব্যবস্থা, যা এসেছে রাজাদের রাজার কাছ থেকে। এই ব্যবস্থা তার নিজ গুণে ও মর্যাদায় আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমরা খ্রীষ্টিয়ানরা যে জীবন যাপন করছি তা এক স্বাধীন জীবন। এখানে কোন বন্দীত্ব বা নিপীড়ন নেই। কারণ আমাদের উপরে এই রাজকীয় ব্যবস্থা কর্তৃত্ব করার ফলে পরস্পরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

৪. রাজকীয় ব্যবস্থা অনুসারে চলার পরেও যদি কোন মানুষ পক্ষপাতিত্ব বা ভেদাভেদ করে, তাহলে তার সেই অন্যায্য কাজের জন্য তাকে কোনভাবেই ক্ষমা করা হবে না। এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, অনেকে ধনী ব্যক্তিদেরকে তোষামোদি করে এবং তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ধনীদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য এ ধরনের তোষামোদি করে। আবার কেউ কেউ মনে করে ঈশ্বর যাকে এই পৃথিবীতে এত অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য দান করেছেন, তার প্রতি তুলনামূলক অধিক সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর খুশি হন। কাজেই প্রেরিত পিতর তাদেরকে এখানে বলছেন যে, তারা যদি ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মন দিয়ে পর্যালোচনা করত তাহলে তারা দেখতে পেত যে, যাদেরকে সম্মান করা প্রয়োজন তাদেরকে তারা সেই উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছে না। কাজেই যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত না করার পাপে তারা দোষীকৃত হবে।

খ. একটি বিশেষ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে এক সাথে সার্বজনীন ব্যবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন: "*যদি পক্ষপাতিত্ব কর, তবে পাপ করছো এবং ব্যবস্থা দ্বারা তোমাদেরকে আদেশ লঙ্ঘনকারী বলে দোষী করা হচ্ছে*, পদ ৯। ব্যবস্থা অনুসারে তোমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসার কথা বলা থাকলেও তোমরা তা করছ না। তাদের অবস্থানে নিজেদের দাঁড় করিয়ে তোমাদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু তোমরা তা না করে মানুষের বাহ্যিক রূপ দেখে তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছ। তোমরা বুঝেও বুঝতে পারছ না যে, ঈশ্বর মানুষের বাহ্যিক রূপ দেখে কাউকে বিচার করেন না। তিনি মানুষের অন্তর ও আত্মা দেখে তার যোগ্য অবস্থান ও মর্যাদা তাকে দেন। কাজেই এই আদেশ লঙ্ঘন করলে তোমরা

চরমভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে।” লেবীয় ১৯:১৫ পদে আমরা এই ব্যবস্থা দেখতে পাই: *তোমরা বিচারে অন্যায় করো না; তুমি দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করো না ও ধনবানের সমাদর করো না*। এখানে রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা নিজেদেরকে ধনীদের ও দরিদ্রদের স্থানে বসিয়ে নিজেদের অবস্থান বিবেচনা করি এবং পরস্পরের প্রতি কেমন মনোভাব হওয়া উচিত তা অনুধাবন করি।

গ. এই ব্যবস্থার আওতা এবং কতটুকু বাধ্যতা এর প্রতি পোষণ করা প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই রাজকীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে এবং একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশও সমানভাবে পালন করতে হবে, নতুবা এর যথাযথ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না: *কারণ যে কেউ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে হোঁচট খায়, সে সকলেরই দায়ী হয়েছে*, পদ ১০। এখানে আমরা যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারি সেগুলো হচ্ছে:-

১. যে প্রসঙ্গ নিয়ে যাকোব এখানে কথা বলছেন: “ধনীদের সমাদর করার বিষয়ে তোমরা কি এই যুক্তি দেবে যে, তোমাদের প্রতিবেশীদের নিজেদের মত ভালবাসতে বলা হয়েছে? কেন তাহলে তোমরা দরিদ্রদের প্রতি তেমন করেই সমাদর ও ভালবাসা প্রকাশ করছ না? তাহলে কি তোমরা আসলে ব্যবস্থাটি যথাযথভাবে পালন না করে কেবল তা পালন করার ভান করছ না?” যে কেউ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে হোঁচট খায়, সে পুরো ব্যবস্থাটিই লঙ্ঘন করেছে বলে বিবেচনা করা হবে। কেউ যদি ভাবে যে, ব্যবস্থার অন্য সব অংশ সঠিকভাবে পালন করার পর একটি অংশ সে পালন না করেও রেহাই পেয়ে যাবে তাহলে সে ভুল করবে। কারণ সবকিছু ঠিক মত সম্পন্ন করে আসার পর একটি মাত্র বিষয় যদি সে সঠিকভাবে না করে, তাহলে তার সমস্ত কাজ অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে। তাকে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করার জন্য অভিযুক্ত হতে হবে। সমস্ত পাপ সমান নয়, কিন্তু সমস্ত পাপের কারণেই ঈশ্বরের ক্রোধ পাপীর উপরে বর্তায় এবং শাস্তি তার জন্য অবধারিত। এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের ভাল কাজগুলো আমাদের খারাপ কাজগুলোকে ঢেকে দেবে এমনটা যদি আমরা ভাবি তাহলে আমরা কত বড় ভুল করি।

২. ভিন্ন আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পদ ১১): *কেননা যিনি বলেছেন, “জেনা করো না,” তিনিই আবার বলেছেন, “নরহত্যা করো না;” ভাল, তুমি যদি ব্যভিচার না করে খুন কর, তা হলে ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারী হয়েছ*। অনেকে হয়তো খুব সহজে জেনায় জড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু কখনোই খুন করতে পারবে না। আবার অন্য কেউ হয়তো নির্দ্বিধায় কাউকে খুন করে বসতে পারে, কিন্তু ব্যভিচার করতে অপারগ। এদের উভয়েই ঈশ্বরের চোখে অপরাধী। কারণ এরা কোন না কোন ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে। বাধ্যতা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্যতা পায় যখন সমস্ত বিষয়ে বাধ্যতা পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে কেউই একটি বিষয়ে বাধ্য হয়ে অপর একটি বিষয়ে অবাধ্য থেকে ঈশ্বরের চোখে বাধ্য ও ধার্মিক হতে পারে না। তাই আমরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণভাবে বাধ্য হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে তাঁর ব্যবস্থার প্রত্যেকটি বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে। *যে কেউ ব্যবস্থা পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থির না*

থাকে, সে অভিশাপগ্রস্ত, গালা ৩:১০।

ঘ. যাকোব খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদেরকে যীশু খ্রীষ্টের ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদেরকে পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। *তোমরা স্বাধীনতার ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত হবে বলে তদনুরূপ কথা বল ও কাজ কর*, পদ ১২। এই অংশটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যেন আমরা শুধু ন্যায্য ও পক্ষপাতিত্বহীন না হই, বরং সেই সাথে দরিদ্রদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও দয়াশীল হই। এর ফলে আমরা ধনীদের প্রতি সকল প্রকার অন্যায্য সমাদর ও পক্ষপাতিত্ব করা থেকে দূরে থাকতে পারব। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. সুসমাচারকে বলা হয়েছে একটি ব্যবস্থা। এতে রয়েছে একটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সকল বৈশিষ্ট্য। পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত সকল বিষয় এতে কথিত হয়েছে। এটি যেমন আমাদের দায়িত্বের কথা প্রকাশ করে, তেমনি আমাদের প্রতি যে সকল প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। খ্রীষ্ট আমাদের উপরে অধিষ্ঠিত সেই রাজা, যিনি আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করেন। আবার একই সাথে তিনি আমাদের কাছে প্রেরিত একজন ভাববাদী যিনি আমাদের শিক্ষা দেন, এবং একজন পুরোহিত যিনি আমাদের পক্ষ হয়ে উৎসর্গ উৎসর্গ করেন ও মধ্যস্থতা করেন।

২. সুসমাচার এক স্বাধীনতার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে আমাদের উপরে স্থাপিত জোঁয়ালি বা বোঝা বলে মনে করার কোন অবকাশ নেই। কারণ সুসমাচার অনুসারে ঈশ্বরের সেবা ও পরিচর্যা করাই আমাদের জন্য যথার্থ স্বাধীনতা। এটি আমাদেরকে সকল প্রকার পার্থিব দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

৩. আমাদেরকে প্রত্যেককে এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা অনুসারে বিচার করা হবে। সুসমাচার অনুযায়ী মানুষের চিরন্তন নিয়তি নির্ধারিত হবে। আমরা যখন ঈশ্বরের বিচারের আসনের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াব তখন এই কিতাবটিই খোলা হবে। যাদেরকে সুসমাচার দোষী সাব্যস্ত করবে তাদের কোন রেহাই নেই। কিংবা যাদেরকে সুসমাচার নির্দোষ বলে রায় দেবে তাদেরকে আর কোনভাবে অভিযুক্ত করা যাবে না।

৪. আমরা এখন যে সমস্ত কথা বলি বা যে সকল কাজ করি সে বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে, কারণ খুব শীঘ্রই আমাদেরকে স্বাধীনতার ব্যবস্থা অনুসারে বিচার করা হবে। অর্থাৎ আমাদেরকে সুসমাচারের শর্ত অনুসারে চলতে হবে, আমাদের চেতনাকে সুসমাচারের আদর্শ অনুসারে দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে এবং আমাদের জীবনাচরণকে করে তুলতে হবে সুসমাচারের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ শেষ দিনে এই সুসমাচারই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

৫. সুসমাচারের দ্বারা আমাদের বিচারের অধীন হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের উচিত দরিদ্রদের প্রতি নিজেদেরকে আরও সদয় ও করুণাশীল করে তোলা (পদ ১৩): *কেননা যে ব্যক্তি করুণা করে নি, বিচার তার প্রতি নির্দয়; করুণাই বিচারের উপর জয়ী হয়*। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) শেষ বিচারের দিনে মন পরিবর্তন করে নি এমন পাপীদেরকে কোন প্রকার দয়া না দেখিয়ে বিচার করা হবে। ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রে কোন দয়া সংমিশ্রিত হবে না।

(২) যারা এখন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি কোন দয়া দেখাচ্ছে না, তারাও সেই মহান দিনে ঈশ্বরের কাছে কোন ধরনের দয়া বা করুণা পাবে না।

(৩) এমন অনেককে পাওয়া যাবে, যারা তাদের আজকের দয়া ও করুণার কাজের জন্য সেই দিনে আনন্দ করবে। তারা সমস্ত বিচারের মাঝেও আনন্দ করবে এবং শান্তি খুঁজে পাবে। সকল মানব সন্তানকে শেষ দিনে হয় ক্রোধের পাত্রে রাখা হবে, নতুবা করুণার পাত্রে রাখা হবে। কোন অবস্থানে আমরা নিজেদেরকে সেই মহান বিচারের দিনে দেখতে চাই সেটা এখন আমাদের বিবেচনা বিষয়। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, *ধন্য যারা করুণাশীল, কারণ তারা করুণা পাবে*।

যাকোব ২:১৪-২৬ পদ

অধ্যায়ের পরবর্তী এই অংশটিতে প্রেরিত যাকোব তাদের ভুলগুলোকে তুলে ধরেছেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেয়, কিন্তু তাদের কথায় ও কাজে খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি পরিপন্থী মনোভাব প্রকাশ পায়। তারা অনন্ত জীবন লাভের আশা করে, কিন্তু সে অনুসারে তারা তাদের জীবনকে পরিচালনা করে না। মানুষ তাদের আশার উপরে নির্ভর করে যে ভিত্তিহীন স্বপ্ন বুনে চলে, তা এখানে নিষ্ফল ও অসার বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষকে শুধু বিশ্বাস দ্বারা বিচার করা হয় না, বরং সেই সাথে তাদের কাজের ভিত্তিতেও বিচার করা হয়। এখন লক্ষ্য করুন:-

ক. এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে, যা মূলত পৌল ও যাকোবের বক্তব্যের মধ্যকার সামঞ্জস্যকে বিরোধের মুখে দাঁড় করায়। রোমীয় ও গালাতীয়দের প্রতি লিখিত পত্রে প্রেরিত পৌল যে কথাগুলো বলেছেন, এখানে প্রেরিত যাকোবের কথাগুলো ঠিক যেন তার বিপরীত কথাই বলছে। যাকোব এখানে পৌলের এ কথার বিরোধিতা করছেন যে, আমরা শুধু বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হই, ব্যবস্থার কাজের দ্বারা নয়। *Amicæ scripturarum lites, utinam et nostræ* – পবিত্র শাস্ত্রের একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশের যে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা আসলে কোন বিরোধ নয়। বরং এই দুটো অংশ একটি আরেকটির পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে মি. ব্যাক্সটার বলেন, "পৌলের পত্রের মর্মার্থ বুঝতে ব্যর্থ হওয়াতে অনেকেই পৌল ও যাকোবের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে মহা সমস্যার মুখোমুখি হন।" অনেক সমঝদার ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং পৌল ও যাকোবের পত্র যে পরস্পর বিরোধী নয় তা উপলব্ধি করতে পারেন। তবে কয়েকটি মাত্র বিষয় বিবেচনা করাটাই এই সমস্যার সমাধান করার জন্য যথেষ্ট:-

১. যখন পৌল বলেছেন যে, একজন মানুষকে ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন অনুসারে নয়, বরং তার বিশ্বাসের দ্বারা বিচার করা হবে (রোমীয় ৩:২৮), তখন তিনি পরোক্ষভাবে যাকোবের বক্তব্যেরই পুনঃসমর্থন করেছেন। তিনি যাকোবের কথার বিরোধিতা করেন নি। তিনি বিশ্বাসের প্রতি পক্ষাবলম্বন করেন নি। পৌল বলতে চেয়েছেন মোশির আইনের প্রতি বাধ্যতার মধ্য দিয়ে যে কাজ করা হয় তার কথা এবং মানুষ কর্তৃক সুসমাচারের বিশ্বাস ধারণ করার কথা। পৌল এমন অনেক লোকদের মধ্যে কাজ করেছেন যারা এই সকল ধার্মিকতার কাজের কারণে নিজেদেরকে এত বেশি উঁচু স্তরের বলে ভাবতে শুরু করেছিল যে, তারা সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছিল। যেমন রোমীয় ১০ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, শুরুতেই তিনি এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু যাকোব এমন কাজের কথা বলেছেন যা সুসমাচারের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে সাধন করা হয়ে থাকে, যা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি কার্যকর ও ফলদায়ী বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হয়। উভয়েরই উদ্দেশ্য সুসমাচারের বিশ্বাসকে উচ্চীকৃত করা, যা আমাদেরকে ধার্মিক গণিত করতে পারে এবং পরিত্রাণ দিতে পারে। পৌলের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ব্যবস্থার যে কোন ধার্মিকতার কাজের গুরুত্ব বিশ্বাসের চেয়ে কম। বিশ্বাসের বদলে কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিলে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা হয়। যাকোব দেখিয়েছেন সেই বিশ্বাসকেই আমরা কীভাবে জাগিয়ে রাখতে পারি ও কার্যকর করে তুলতে পারি এবং এর জন্য আমাদের কী কী করা প্রয়োজন, যা ধার্মিকতার কাজ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২. যাকোবের বলা বিভিন্ন ধরনের কাজের কথাই শুধু যে পৌল বলেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি ভাল কাজ দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন মঙ্গলজনক বিষয়ের কথাও তাঁর বক্তব্যে রেখেছেন, যা যাকোবের পত্রের এই অংশে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের কাজের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিল তাদেরকে নিয়ে পৌল কাজ করেছেন। সে কারণে তিনি তাদের কাজের পক্ষাবলম্বন করে কোন কথা বলেন নি। যাকোব এমন লোকদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করেছেন যারা তাদের তথাকথিত বিশ্বাস সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেই বিশ্বাসের পরিচায়ক কোন কাজ তাদের মধ্যে দেখা যেত না। তারা নামেই শুধু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু বিশ্বসীসুলভ কোন কাজ তারা করতো না। এ কারণে তাদেরকে বিশ্বাসের পরিচায়ক ভাল কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বরীয় একটি বিধানের দ্বারা অন্য আরেকটিকে আমরা কখনোই লঙ্ঘন করতে পারি না। আবার প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরীয় বিধান অমান্য করাও আমাদের পক্ষে পাপ। সে কারণে যারা ব্যবস্থাকে মান্য করতে গিয়ে সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে, আবার যারা সুসমাচার মান্য করতে গিয়ে ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে, তারা উভয়েই ভুল করে। আমাদেরকে একাধারে যেমন যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করতে হবে, তেমনি সেই বিশ্বাসের ফলদায়ক ভাল কাজও করতে হবে।

৩. পৌল যে ধার্মিক গণিত হওয়ার কথা বলেছেন, তা যাকোবের বক্তব্য থেকে আলাদা। একজন বলেছেন ঈশ্বরের সামনে ব্যক্তির ধার্মিক গণিত হওয়ার কথা, অপরজন বলেছেন মানুষের সামনে বিশ্বাস ধার্মিক গণিত হওয়ার কথা। যাকোব বলেছেন, "কাজের মধ্য দিয়ে

তোমার বিশ্বাস আমাকে দেখাও। যারা তোমার কাজ দেখবে তাদের চোখে তোমার বিশ্বাস ধার্মিক বলে গণিত হোক।" কিন্তু পৌল ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক গণিত হওয়ার কথা বলেছেন। যীশু খ্রীষ্টের উপরে যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের পরিত্রাণের জন্য একমাত্র তাঁর উপরেই নির্ভর করে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে তাদের বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়া প্রয়োজন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের ব্যক্তিত্ব বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক গণিত হয়। কিন্তু মানুষের সামনে যদি আমরা আমাদের বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গণিত হতে যাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে। এখানেই পৌল ও যাকোবের বক্তব্যের মধ্যকার যোগ্যসূত্র। পৌল যা ঘোষণা করেছেন, যাকোব তারই ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘোষণা করছেন।

৪. পৌল যে ধার্মিক গণিত হওয়ার কথা বলছেন তা এখনও সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয় নি। কিন্তু যাকোব যে ধার্মিক গণিত হওয়ার কথা বলেছেন তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই কেবল আমরা ধার্মিকতাপূর্ণ অবস্থানে আসতে পারি। কিন্তু ভাল কাজের প্রকাশ তখনই সম্ভব যখন আমরা মহান শেষ বিচারের দিনের জন্য নিজেদেরকে ধার্মিক হিসেবে প্রস্তুত করে তুলব।

খ. পবিত্র শাস্ত্রের দুই অংশের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব নিরসনের পর এখন আমরা দেখি, এই অংশ থেকে যা আরও সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের শেখা প্রয়োজন তা যাকোব আমাদেরকে বলছেন। আমরা এখানে শিখতে পারি:-

১. কর্মবিহীন বিশ্বাস কোন কাজে আসে না। অর্থাৎ তা আমাদেরকে জীবন বা পরিত্রাণ দিতে পারে না। যদি একজন মানুষের বিশ্বাস থাকে কিন্তু সেই বিশ্বাসের কোন কর্ম না থাকে, তাহলে কী লাভ? সেই বিশ্বাস কি তাকে পরিত্রাণ দিতে পারবে? এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) যে বিশ্বাস আমাদেরকে জীবন দিতে পারে না, সেই বিশ্বাস আসলেই কোন উপকারে আসে না। শুধু নামেই খ্রীষ্টিয় হয়ে হয়তো লোকদের কাছ থেকে সাময়িকভাবে সম্মান কুড়ানো যায়, এবং কোন কোন সময় পার্থিব সম্পদ অর্জনেও তা সহায়ক হয়। কিন্তু আত্মাকে পরিত্রাণ দানের ক্ষেত্রে তা কি আদৌ কোন কাজে আসে? মানুষ কি শুধু তথাকথিত বিশ্বাসের উপরেই ভর করে পরিত্রাণ পেতে পারে? আমাদের আত্মাকে কোনটি পরিত্রাণের পথে নিয়ে যায় ও কোনটি যায় না তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের সমস্ত কাজ বিচার করতে হবে। যা আমাদেরকে অনন্ত জীবনের পরিত্রাণ দান করে না, তা ধরে রাখা কোন যুক্তি নেই।

(২) একজন মানুষের বিশ্বাস থাকা, আর তার বিশ্বাস আছে এমন উক্তি করা এক কথা নয়। প্রেরিত যাকোব বলেন নি যে, *যদি কোন মানুষের কর্মবিহীন বিশ্বাস থাকে*; কারণ তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য তা নয়। পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে, কর্মবিহীন কোন অভিমত, কোন দর্শন, বা কোন বিশ্বাস বিশ্বাস হতে পারে না। মানুষ

অন্যের কাছে তার বিশ্বাস নিয়ে গর্ব করতে পারে, কিন্তু তার কথার সাথো কাজের যদি কোন সঙ্গতি না থাকে তাহলে সেই বিশ্বাস জীবন্ত হতে পারে না।

২. আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, ভালবাসা বা দানশীলতা যেমন এক প্রায়োগিক নীতি, ঠিক তেমনি বিশ্বাসও কোন স্থবির অভিমত বা অভিজ্ঞান নয়। কোন ব্যক্তি যদি বলে থাকে তার মাঝে বিশ্বাস আছে, কিন্তু তার কাজের মধ্য দিয়ে যদি আমরা তা বুঝতে না পরি, তাহলে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। “কোন ভাই কিংবা বোনের কাপড়-চোপড় না থাকলে ও প্রতিদিন যে খাবার প্রয়োজন তা না থাকে আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাদেরকে বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেহের প্রয়োজনীয় বস্তু না দাও, তবে তাতে কী লাভ হবে?” পদ ১৫-১৬। শুধুমাত্র কথার মধ্য দিয়ে এ ধরনের ভালবাসা প্রকাশ করলে কার কী উপকার হবে? এতে করে আমাদের মুখই শুধু ভালবাসা ও দানশীলতার কথা ঘোষণা করবে। কিন্তু আমাদের অন্তর ও আত্মায় যে ভালবাসা মানুষের জন্য রয়েছে তা কখনোই প্রকাশ পাবে না। আমরা কি ঈশ্বরের সামনে এ ধরনের ফাঁপা বুলি নিয়ে প্রমাণ করতে চাই যে, আমাদের মধ্যে ভালবাসা রয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষের সামনে যদি আমরা সত্যিই আমাদের ভালবাসা প্রমাণ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শতভাগ আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে মানুষের উপকার করতে হবে। *বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ যুক্ত না থাকলে নিজে একা বলে তা* মৃত, পদ ১৭। আমরা খুব সহজেই আমাদের বিশ্বাসের কথা মুখ দিয়ে ঘোষণা করি আর ভাবি যে, এতেই আমরা পরিত্রাণ পাব। কিন্তু আমরা ভাবি না যে, আমাদের এই সস্তা ধার্মিকতা কখনোই আমাদের বিশ্বাসকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণযোগ্য করে তোলে না। “আমি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমস্ত নিয়ম-কানুন অনুসরণ করি” – এ কথা বলে কখনোই প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া যায় না। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা চিন্তা করলে তা হবে আকাশ-কুসুম কল্পনা। মিথ্যা ভালবাসার মতই মিথ্যা বিশ্বাসও ঘৃণার যোগ্য। দুটোই উৎপন্ন হয় খোদাবিহীন হৃদয় থেকে। ঈশ্বর প্রকৃত বিশ্বাসবিহীন কোন মৃত আত্মা গ্রাহ্য করেন না।

৩. আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেন কর্মবিহীন বুলিসর্বস্ব বিশ্বাসের পাশাপাশি রেখে সাক্ষ্যরূপ কর্মযুক্ত বিশ্বাস তুলনা করি, পার্থক্য নির্ণয় করি এবং কোনটি আমরা গ্রহণ করব তা চিন্তা করি। “কেউ বলবে তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কাজ আছে; তোমার কাজ ছাড়া বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কাজের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস দেখাব,” পদ ১৮। ধরুন কোন প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি একজন গর্বকারী ভণ্ডকে এভাবে বলছেন, “তুমি বলে বেড়াও যে তোমার বিশ্বাস আছে। আমি এ ধরনের কথা বলে আমার গর্ব প্রকাশ করব না। বরং আমার কাজই আমার হয়ে কথা বলবে। তাহলে তুমি এবার এমন কোন প্রমাণ দাও তোমার কর্মবিহীন বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করবে। আমি তোমাকে দেখাব আমার কাজের মধ্য দিয়ে কীভাবে আমার বিশ্বাসের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়।” এটি এমন একটি প্রমাণ যা পবিত্র শাস্ত্র মানুষকে নিজের ও অন্যদের যাচাই করার জন্য শিক্ষা দেয়। এই প্রমাণ বা সাক্ষ্য অনুসারেই শেষ বিচারের দিনে যীশু খ্রীষ্ট প্রত্যেকটি মানুষকে বিচার করবেন। সমস্ত মৃত লোকদেরকে তাদের কাজ অনুসারে বিচার করা হবে, প্রকাশিত

বাক্য ২০:১২। এখন যে সমস্ত লোক তাদের ঠুনকো বিশ্বাস নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে, তারা শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বরের কাছে মহা অপরাধে দণ্ডিত হবে।

৪. আমরা এখানে শিক্ষা পাই যে, শুধুমাত্র মুখের কথায় যে বিশ্বাস প্রকাশ পায় সেই বিশ্বাস শয়তানের মুখেও প্রকাশিত হয়ঃ তুমি বিশ্বাস করেছ যে, ঈশ্বর এক, ভালই করেছো; মন্দ আত্মারাও তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে। এখানে প্রেরিত যাকোব যে বিশ্বাসের কথা বলছেন তা খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রথম মূলনীতি প্রকাশ করেঃ "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।" নাস্তিকরা এই নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যেহেতু তারা কোন সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না। পৌত্তলিকরাও এই নীতি সম্পূর্ণভাবে মানে না, যেহেতু তারা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। কিন্তু অন্য আর সকল ধর্ম, যেখানে মাত্র একজন সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করা হয়, সে সকল ধর্মের প্রত্যেকটিতে এই নীতি প্রযোজ্য। যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তারাও প্রত্যেকে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে যে, মাত্র একজন ঈশ্বর রয়েছেন। তিনিই আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি শয়তান, যে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় শত্রু ও বিপক্ষ, সেও ঈশ্বরকে মানে এবং তাঁর ভয়ে কাঁপে। সে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করুক আর না করুক, প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ বিশ্বাস তার মাঝে রয়েছে। আমরা যদি শুধু এ কথা বলি যে, ঈশ্বরের উপরে আমরা বিশ্বাস করেছি, তাহলে তা আমাদের ধর্ম পালনের প্রাথমিক মূলনীতি প্রকাশ করে, যা শয়তানও বিশ্বাস করে থাকে। শয়তানের এই বিশ্বাস তাকে কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। সে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ থেকে ভয়ে কাঁপে না। বরং সে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ সহকারে ঈশ্বরকে ভয় করে। এ কারণে আমাদের বিশ্বাস-সূত্র থেকে, "আমি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছি" এ কথা মুখ দিয়ে বললেই আমরা তাঁর বিশ্বস্ত বিশ্বাসী হয়ে যাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদেরকে সুসমাচারের নির্দেশনা অনুসারে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি, তাঁকে ভালবাসি, তাঁর উপস্থিতিতে থেকে আনন্দিত হই, তাঁর সেবা করি, অর্থাৎ যে কাজগুলো শয়তান করে না বা করতে পারে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শয়তান থেকে কোন অংশে আলাদা নই।

৫. আমরা এখানে শিখতে পারি, যে ব্যক্তি কর্মবিহীন বিশ্বাস নিয়ে গর্ব করে, তাকে একজন মূর্খ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু হে অসার মানুষ, তুমি কি জানতে চাও যে, কাজ ছাড়া বিশ্বাস কোন কাজের নয়? পদ ২০। এখানে অসার মানুষ, *anthrope kene* শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে মানুষের এমন এক অবস্থাকে, যখন একজন মানুষের মধ্য থেকে কোন ভাল কাজের প্রত্যাশা করা যায় না এবং ঈশ্বরের চোখে সে কেবলমাত্র একজন মূল্যহীন অথর্ব ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, তথাপি সেই লোকটি তার বিশ্বাস নিয়ে ফাঁপা বুলি আওড়ায় এবং মিথ্যা অহঙ্কার করে। কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের বিশ্বাস শুধু যে মানুষের আত্মিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা নয়, সেই সাথে তা অনন্ত জীবনকেও করে তোলে অনিশ্চিত। যে বিশ্বাসীরা শুধু নামেই নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেয়, তারা আসলে রূহানিকভাবে মৃত।

৬. আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত বিশ্বাস কখনো কর্মবিহীন হতে পারে না। আমরা দুটি দৃষ্টান্ত থেকে তা বুঝতে পারি, অব্রাহাম ও রাহব।

(১) প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে ইব্রাহিমের, যিনি বিশ্বাসীদের আদিপিতা এবং ধার্মিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ। তাঁর প্রতি যিহূদীদের রয়েছে এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান (পদ ২১): "আমাদের পিতা অব্রাহামকে তাঁর কাজের জন্য, অর্থাৎ বেদীর উপরে তাঁর পুত্র ইস্হাককে উৎসর্গ করার জন্য কি ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয় নি?" অপরদিকে পৌল বলেছেন (রোমীয় পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে) যে, অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা হিসেবে গণিত হয়েছিল। কিন্তু ইব্রীয় ১১ অধ্যায় দেখলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি এই অংশের মূল ব্যাখ্যা কী। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, অব্রাহাম ও রাহব উভয়ের বিশ্বাস থেকেই ভাল কাজের সূত্রপাত ঘটেছিল, যে কাজের কথাই যাকোব বলছেন। বিশ্বাস থেকে ভাল কাজ কখনো পৃথক করা যায় না। অব্রাহাম যে সমস্ত ভাল কাজ করেছিলেন সেগুলোর মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে, তিনি যে বিশ্বাস করেছিলেন তা খাঁটি ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের বাক্য স্বয়ং বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তোলে। আদিপুস্তক ২২:১৬,১৭ পদে বলা হয়েছে, "তুমি এই কাজ করলে, আমাকে তোমার একমাত্র পুত্রকে দিতে অসম্মত হলে না, এজন্য আমি আমারই নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করবো এবং আকাশের তারার মত ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মত তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করবো।" এভাবেই এক কার্যকারী বিশ্বাসের মত অব্রাহামের বিশ্বাস (পদ ২২) ভাল কাজ সাধন করেছিল এবং কাজের জন্য তাঁর বিশ্বাস সিদ্ধ হল। এই কথার মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের অংশটি পুরোপুরিভাবে বুঝে উঠতে সক্ষম হই, যেখানে বলা হয়েছে, *অব্রাহাম ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করলেন এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল*, পদ ২৩। এভাবেই তিনি ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন। বিশ্বাসের দ্বারা তিনি ধার্মিকতার কাজ করায় ঐশ্বরিক সত্তা তাঁর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে অত্যন্ত বিশেষ অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করলেন। অব্রাহামের জন্য এটি অত্যন্ত সম্মানের একটি বিষয় যে, তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে করে আমরা বুঝতে পারি যে, কী করে কাজের মধ্য দিয়ে একজন মানুষকে ধার্মিক বলে বিচার করা যায়, শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা নয়। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের সাথে মানুষের এক চমৎকার অনুগ্রপূর্ণ ও বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেবল কোন অভিমত, কোন ধারণা বা কোন আদেশ বাধ্যতার সাথে পালন করা নয়, বরং বিশ্বাসের দ্বারা কৃত কাজই এ ধরনের সম্পর্কের সূচনা ঘটাতে পারে। এখন অধ্যায়ের এই অংশে যাকোব যে শিক্ষা আমাদেরকে দিচ্ছেন, এর বাইরেও বহু বিষয় রয়েছে যা থেকে আমরা অব্রাহামের জীবন সম্পর্কে শিখতে পারি।

[১] যারা অব্রাহামের অনুগ্রহ লাভ করবে তাদেরকে অবশ্যই তাঁর মত বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। অব্রাহামের বংশধর হওয়া নিয়ে গর্ব করলে শুধু চলবে না, বরং সেই সাথে তিনি যেভাবে জীবন যাপন করেছেন সেভাবে জীবন যাপন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

[২] যে সমস্ত কাজ সত্যিকার বিশ্বাসের পরিচয় দেয় সেগুলো অবশ্যই আত্মত্যাগের কাজ হতে হবে। ঈশ্বর স্বয়ং যে নির্দেশ দেন সেই নির্দেশ অনুসারে কাজগুলো করতে হবে,

মানবীয় রক্ত মাংসের তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়। অব্রাহাম যেভাবে ঈশ্বরের আদেশে বিনা দ্বিধায় তাঁর ছেলেকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, ঠিক তেমন দৃঢ় বিশ্বাস ও বাধ্যতা আমাদের জীবনে থাকতে হবে।

[৩] ঈশ্বরের জন্য আমরা ধার্মিকতার যে লক্ষ্য অর্জন করতে চাই ও আন্তরিকতার সাথে যে কাজ করতে চাই, তা তখনই গৃহীত হবে যখন আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অব্রাহাম তাঁর ছেলেকে উৎসর্গ দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর সেই উৎসর্গ দিতে হয় নি। তিনি তাঁর অন্তরে ঠিকই তাঁর ছেলেকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আত্মায় সেই বাধ্যতার দৃঢ় প্রত্যয় কাজ করছিল। সে কারণে ঈশ্বর তাঁর সেই অন্তঃকরণ দেখেছিলেন ও তা গ্রহণ করেছিলেন।

[৪] বিশ্বাসের কাজ বিশ্বাসকে ক্রমাগতভাবে আরও বৃদ্ধি করে এবং বিশ্বাসের সত্য তা থেকে ভাল কাজের সূচনা ঘটায়।

[৫] এ ধরনের কার্যকরী বিশ্বাস অন্যদেরকেও করে তোলে বিশ্বাসের প্রতি সঙ্কল্পবদ্ধ। এই বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরের বন্ধু করে তোলে, যেমন হয়েছিলেন ইব্রাহিম। এ কারণেই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, *আমি তোমাদেরকে বন্ধু বলেছি*, যোহন ১৫:১৫। ঈশ্বর ও প্রকৃত বিশ্বাসীদের আত্মার মধ্যকার সমস্ত ভাবের আদান-প্রদান অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও আনন্দজনক। এই বন্ধুত্বে অন্তরের ইচ্ছা ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, তাতে থাকে এক অনুপম পারস্পরিক বোঝাপড়া।

(২) দ্বিতীয় যে বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দেখতে পাই তা হচ্ছে রাহবের বিশ্বাস ও তার পরিচায়ক কাজ: "আবার পতিতা রাহবকেও কি সেই ভাবে কাজের জন্য ধার্মিক বলে গণনা করা হয় নি? তিনি তো দূতদের আতিথিয়তা করেছিলেন; এবং অন্য পথ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন," পদ ২৫। এর আগের দৃষ্টান্তে আমরা এমন একজনকে দেখি যিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য তাঁর সমগ্র জীবদ্দশায় একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। কিন্তু এখন আমরা যার কথা দেখছি তিনি ছিলেন একজন পা যীশুর মানুষ, যার বিশ্বাসের মাত্রা ছিল নিচু স্তরের। কিন্তু তাই বলে উঁচু স্তরের বিশ্বাস তো নয়ই, নিচু স্তরের বিশ্বাসও কখনো কাজের ফল প্রকাশ করবে না এমন হওয়া উচিত নয়। অনেকে বলেন যে, এখানে পতিতা শব্দটি উল্লেখ করা হলেও তা আসলে রাহবের নামকে বুঝিয়ে থাকে। আবার অনেকে বলে থাকেন যে, তিনি আসলে কেবল একটি সরাইখানার মনিব ছিলেন, অর্থাৎ যেখানে ভ্রমণকারী অর্থের বিনিময়ে রাত্রি যাপন করতো। সেই সরাইখানাতেই ইস্রায়েলের গুপ্তচরেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাহব একজন দুশ্চরিত্রা মহিলা ছিলেন। আর এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে সেটাই প্রকাশ পায় যে, সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তিটিও তার বিশ্বাসের জন্য উদ্ধার পাবে, যখন তার বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। যারা অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ, তারাও তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ না দেখালে উদ্ধার পেতে পারে না। এই রাহব ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের ক্ষমতাসম্পন্ন উপস্থিতির কথা শুনেছিলেন এবং তা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তার এই বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছিল তখন,

যখন তিনি তার নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেই গুপ্তচরদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে যেতে দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] পাপীদেরকে রূপান্তর ও পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের অসাধারণ ক্ষমতা।

[২] ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ ও আনুকূল্য লাভের জন্য একটি কার্যকর বিশ্বাসের যা কিছু অপরিহার্য।

[৩] রাহবের মহা পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ তিনি তার নিজ জাতির লোকদের পক্ষ অবলম্বন না করে ঈশ্বরের গৌরব সাধন ও তাঁর জাতির লোকদের রক্ষা করার জন্য কাজ করেছিলেন। এই কাজের কারণে তার বিগত জীবনের সমস্ত অন্যায় অপরাধ ও পাপ মুছে গিয়েছিল এবং তিনি এক ধার্মিকতাপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি ধার্মিক বলে গণিত হওয়ার পরও তার বিগত জীবনের কথা মনে রাখা হয়েছে; তবে এর উদ্দেশ্য তাকে অপদস্থ করা নয়, বরং ঈশ্বরের মহা দয়া ও অনুগ্রহের গৌরব করা। এ কারণে ধার্মিক বলে গণিত হওয়ার পরও তাকে *পতিতা রাহব* নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

৭. এই অধ্যায়ে আলোচনার ইতি টেনে সারাংশ হিসেবে প্রেরিত যাকোব বলছেন, *বাস্তবিক যেমন আত্মা ছাড়া দেহ মৃত, তেমন কাজ ছাড়া বিশ্বাসও মৃত*, পদ ২৬। এই বক্তব্যটিকে বিভিন্নভাবে পাঠ করা হয়ে থাকে। অনেকে এর অর্থ করে থাকেন এভাবে, শ্বাস ছাড়া যেমন দেহে জীবন থাকে না, ঠিক তেমনি কাজ ছাড়া বিশ্বাসও জীবন্ত থাকতে পারে না। তাদের মতে ভাল কাজ বিশ্বাসেরই অঙ্গ, ঠিক যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস জীবনের অপরিহার্য উপাদান। আবার অন্যান্য অনেকের মতে, আত্মা ছাড়া দেহ যেমন মৃত, ঠিক সেভাবেই কাজ ছাড়া বিশ্বাস মৃত। আত্মা দেহ ত্যাগ করলে দেহ যেমন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, তাতে আর কোন সৌন্দর্য থাকে না, তা এক অপাঙ্কতেয় শূন্য খাঁচায় পরিণত হয়, ঠিক সেভাবেই যে বিশ্বাসের সাথে কোন কাজ থাকে না, সেই বিশ্বাসও একইভাবে অগ্রহণযোগ্য ও অকার্যকর।

(১) সবচেয়ে ভাল কাজটিও অসার, মৃত, যদি তা বিশ্বাস থেকে করা না হয়। প্রতিটি ভাল কাজের মূলে ও গভীরে প্রয়োজন দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসের কারণেই আমরা যা কিছু করি তা আমাদের জীবনের ভাল কাজ হয়ে দেখা দেয়। সেই কাজ হয়ে ওঠে ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য।

(২) বিশ্বাস যদি কর্মবিহীন হয়, তাহলে সেই বিশ্বাস মুখে যতই ঘোষণা করা হোক না কেন তা মৃত। কোন সবুজ পাতা না গজালে ও কোন ফল না দিলে একটি গাছের শিকড় মৃত বলে যেমন ধরে নেওয়া হয়, ঠিক সেভাবে বিশ্বাসের ফল না প্রকাশিত হলে সেই বিশ্বাস মৃত সাব্যস্ত হয়। বিশ্বাস হচ্ছে শিকড়, ভাল কাজ হচ্ছে ফল। দুটোই প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের কখনো এমনটা মনে করা উচিত নয় যে, একটি ছাড়া অন্যটি আমাদেরকে ধার্মিক গণিত করতে পারে ও পরিত্রাণ দিতে পারে। এটাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ যার উপরে নির্ভর করে আমরা বাঁচি।

যাকোবের লেখা পত্র

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে লেখক মানুষের উচ্চাভিলাষ ও ঔদ্ধত্বপূর্ণ জিহ্বার প্রতি তিরস্কার করেছেন। সেই সাথে তিনি এর মন্দ সাধন করার ক্ষমতা ও এর বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্য আমাদের দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন। যারা নিজেদেরকে ধার্মিক হিসেবে প্রকাশ করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই বিশেষভাবে জিহ্বা দমন করতে হবে, পদ ১-১২। প্রকৃত জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে করে নম্র। একজন জ্ঞানী মানুষ সকল প্রকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ এড়িয়ে চলে। এ কারণে তা পার্থিব ও ভণ্ডামিপূর্ণ জ্ঞান থেকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে, পদ ১৩-১৮।

যাকোব ৩:১-১২ পদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়টি দেখিয়েছে কর্মবিহীন বিশ্বাস কতটা অকার্যকর ও মৃত। আর এই অধ্যায়ে শুরুতেই স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, এই ধরনের মৃত বিশ্বাসের কারণে মানুষ তাদের আচরণ ও কথাবার্তায় ভণ্ডামি প্রকাশ করে থাকে। যারা মিথ্যা বা মৃত বিশ্বাস ধারণ করে, তারা সব ধরনের জিহ্বার পাপ ও অধার্মিকতায় নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। এ কারণেই মানুষের উচিত সব ক্ষেত্রে তাদের জিহ্বার মন্দতা প্রতিরোধ করা এবং নিজেদেরকে সতর্ক রাখা। এ কারণে আমাদেরকে শেখানো হয়েছেঃ-

ক. আমরা যেন অন্যদের উপরে কর্তৃত্ব বা ওস্তাদি করার জন্য নিজেদের জিহ্বাকে ব্যবহার না করিঃ *হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা অনেকে শিক্ষক হতে যেয়ো না*, পদ ১। এই আয়াতের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া বা অন্যদেরকে নির্দেশনা দেওয়া, কিংবা খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ধার্মিকতার পথে চলার জন্য শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে না। বরং বলা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত নয় বা এএভাবে কথা বলা উচিত নয় যেন সমপর্যায়ে অন্যদের কাছে এটা মনে না হয় যে, আমরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করছি। আমাদের উচিত সহ-বিশ্বাসীদেরকে পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু অন্যের ভাললাগা বা অনুভূতিকে আঘাত করে নিজের মত ও ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। কারণ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও মেধা দিয়েছেন। তাই তিনি চান যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজে

অংশগ্রহণ করা। তাই যাকোব এখানে আমাদের প্রতি এই শিক্ষা দিচ্ছেন, যেন আমরা প্রত্যেকেই একেকজন গুরু বা শিক্ষক হয়ে না উঠি। অভিষিক্ত না হয়ে মানুষের উপরে শিক্ষক, গুরু, বা বিচারক হওয়ার অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হয় নি। বরং আমাদের উচিত নম্রতা ও শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলা। অন্যের সমালোচনা করার বদলে আমাদের উচিত নিজেদেরকে কথায় ও কাজে আদর্শ হিসেবে স্থাপন করা।" দুটি কারণে এই দায়িত্বটি বিশেষভাবে পালনীয়:-

১. যারা এভাবে নিজেদেরকে মানুষের বিচার ও সমালোচনা করার জন্য নিযুক্ত করবে, তারা সবচেয়ে বড় অপরাধে অভিযুক্ত হবে। আমরা যদি অন্যদের বিচার করি, তাহলে আমাদের বিচার আরও কঠিন হবে, মথি ৭:১,২। যারা অন্যদের ভুলগুলো খুঁজে বের করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে এবং নিজেদেরকে নির্ভুল বলে মনে করে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, তাদের কথা ও কাজ ধরে ঈশ্বর তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করবেন।

২. এভাবে অন্যদের উপরে কর্তৃত্ব না করার আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, আমরা সকলেই পাপী: *আমরা অনেক ভাবে হোঁচট খাই*, পদ ২। আমাদের যদি নিজেদের ভুল ও অপরাধগুলোকে নিয়ে আরও বেশি করে চিন্তা করি, তাহলে আমরা অন্যদের সমালোচনা তত কম করব। অন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যখন আমরা তাদের পাপ হিসাব করতে শুরু করি, তখন আর আমরা এই হিসাব করি না যে, আমাদের নিজেদের আরও কত গুরুতর পাপ রয়েছে। যারা নিজেরা অন্যদের বিচার করে তারা আসলে নিজেদের সাথে ধোঁকাবাজি করে। আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে দোষী অপরাধী। যারা অন্যদের ভুলত্রুটি দেখে চোখ কুঁচকোয়, তারা জানেই না যে, জেনে বা না জেনে তারা ঈশ্বরের চোখে কত অপরাধ করছে। শুধু তাই নয়, হয়তোবা তাদের সমালোচনার জিহ্বা ও ভর্ৎসনাসূক কথা দিয়ে তারা অন্যদের চেয়ে আরও বেশি পা যীশুর হয়ে উঠছে। আমাদের উচিত অন্যদের সমালোচনা ও বিচার করার বদলে আত্মসমালোচনা করা এবং অন্যদের বিষয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রে সদয় হওয়া।

খ. আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা আমাদের জিহ্বাকে দমন করার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে যথার্থ ও ধার্মিক হিসেবে প্রতিপন্ন করি: *যদি কেউ কথা দ্বারা হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখতে সমর্থ*। এখানে পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, যার বিবেক জিহ্বার পাপে আক্রান্ত নয় এবং যে নিজেকে এ ধরনের পাপের সকল প্রবণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি এবং তার মাঝে নিঃসন্দেহে প্রকৃত অনুগ্রহের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু অপরদিকে যদি কোন লোক নিজেকে ধার্মিক বলে প্রকাশ করে এবং তার নিজের জিহ্বা বলগা দ্বারা বশে না রাখে, তাহলে সেই লোকের ধর্ম অসার। উপরন্তু, যে ব্যক্তি কথার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, সে শুধু যে একজন আন্তরিক বিশ্বাসী তা-ই নয়, সেই সাথে সে একজন আধুনিক ও খোদায়ী মানসিকতাসম্পন্ন খ্রীষ্টিয় বিশ্বসী। যে অনুগ্রহে বলীয়ান হয়ে একজন বিশ্বাসী তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, সেই একই অনুগ্রহ তাকে তার সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে শক্তি জোগায়। দুটি বিষয়ের তুলনার মধ্য দিয়ে আমরা এই

বিষয়টি বুঝতে পারি:-

১. একটি ঘোড়ার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা ও নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তার মুখে বলগা দেওয়া হয়: *ঘোড়াগুলোকে বাধ্য রাখতে আমরা যদি তাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে তাদের সমস্ত শরীরও ইচ্ছামত ঘুরাতে পারি*, পদ ৩। আমাদের মধ্যে উচ্চৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার এক সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। আমাদের জিহ্বা এই প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করে থাকে। সে কারণে জিহ্বাকে বলগা দিয়ে দমন করতে হবে। গীতসংহিতা ৩৯:১ পদে বলা হয়েছে, *আমি আমার পথে সাবধানে চলবো, যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি; যতদিন আমার সাক্ষাতে দুর্জন থাকে, আমি মুখে জাল্‌তি বেঁধে রাখব*। আমাদের জিহ্বা যত বেশি অনিয়ন্ত্রিত হবে, তত বেশি আমাদের উচিত হবে তা দমনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া। নতুবা অনিয়ন্ত্রিত ও বন্য ঘোড়া যেমন আরোহীকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, সেভাবে অনিয়ন্ত্রিত জিহ্বাও তার মনিবকে অমান্য করতে থাকবে। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা, কথা ও কাজ লক্ষ্য করছেন। তাই আমাদের উচিত সব সময় নিজেদের জিহ্বাকে বশে রাখা। তাহলে আমাদের সমস্ত দেহই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

২. সঠিকভাবে হাল ধরলে জাহাজ চালানো সহজ হয়: *আর দেখ, যদিও জাহাজগুলো অতি প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড বাতাস সেটি ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও সেটিকে একটি ছোট হাল দ্বারা নাবিকের মনের ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরাতে পারে*, পদ ৪,৫। হাল জাহাজের একটি ছোট্ট অংশ, ঠিক তেমনি জিহ্বাও দেহের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ। কিন্তু সঠিকভাবে হাল নিয়ন্ত্রণ করলে একটি জাহাজকে যেদিকে খুশি সেদিকে নিয়ে যাওয়া যায়, এমনকি প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেও গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সেভাবেই জিহ্বাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পুরো মানুষটিকেই বশে রাখা যায়। এই তুলনাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত সৌন্দর্য রয়েছে, যা আমাদের প্রতি এ কথা প্রকাশ করে যে, অত্যন্ত ছোট কোন জিনিসও অনেক সময় অনেক বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে বা প্রভাব ফেলতে পারে। ছোট জিনিসও অনেক বড় বা ভাল কাজ করতে কিবা বড় ধরনের আঘাত দিতে সক্ষম।

গ. আমাদেরকে এখানে শেখানো হচ্ছে যেন আমরা অনিয়ন্ত্রিত জিহ্বাকে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে বিবেচনা করি। এ ধরনের জিহ্বাকে প্রচুর দাহ্য পদার্থের মধ্যে রাখা আগুনের একটুখানি ফুলকির সাথে তুলনা করা যায়, যা মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা সৃষ্টি করতে পারে। *দেখ, কেমন অল্প আগুন কেমন বড় বন-জঙ্গলকে জ্বালিয়ে দেয়! জিহ্বাও আগুনের মত; আমাদের অঙ্গগুলোর মধ্যে জিহ্বা অধর্মের পৃথিবী হয়ে রয়েছে; তা সমস্ত দেহকে কলঙ্কিত করে ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে এবং নিজে নরকের আগুনে জ্বলে উঠে*, পদ ৫,৬। জিহ্বায় এত বেশি পাপ জড়িত থাকে যে, তাকে অধর্মের পৃথিবী বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে হয়েছে। কত না অধার্মিকতাকে এই জিহ্বা উসকে দেয়! কত না পাপের আগুন তা প্রজ্জ্বলিত করে! জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ যা দেহের অন্য সকল অঙ্গকে কলুষিত করে তুলতে পারে। এ কারণে জিহ্বার পাপ সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এখানে লক্ষ্য করুন, জিহ্বার পাপ মানুষকে সবচেয়ে বেশি পা যীশুর করে তোলে। এই অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গের কারণেই আমাদের সমস্ত কলুষতাময় আকাঙ্খা, অভিলাষ ও কামনা

প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। প্রায়শই জিহ্বার জন্য পুরো দেহ পাপে আক্রান্ত হয়। এ কারণে রাজা শলোমন বলেছেন, *তুমি তোমার কথার দরুন নিজেকে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে দিও না*, উপদেশক ৫:৬। জিহ্বার কারণে মানুষ অনেক সময় যে সমস্ত কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে পড়ে তা তাদের জন্য হয়ে পড়ে অসহনীয় এবং তা অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা *প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে*। মানব জাতির ও সমাজের কার্যক্রম অনেক সময় জিহ্বার কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয় ও পাপের পথে ধাবমান হয়। অনেকে এই অংশটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন, আমাদের সমস্ত বংশধরেরা জিহ্বার আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন যুগ নেই, কিংবা জীবনের এমন কোন পর্যায় নেই যখন মানুষ এই জিহ্বার পাপগারিতায় আক্রান্ত হয় নি। সে কারণেই যাকোব বলেছেন, তা *নিজে নরকের আগুনে জ্বলে উঠে*। এখানে লক্ষ্য করুন, জিহ্বার পাপ পৃথিবীতে নরকের আগুন জ্বালিয়ে তোলে এবং তাতে মানুষকে পোড়ায়, যা মানুষ বুঝতেও পারে না। শয়তানের সূক্ষ্ম চাতুরিতে মানুষের জিহ্বা হয়ে ওঠে নরকের আগুনের শিখা। শয়তানকে বলা হয় মিথ্যাবাদী, অপবাদকারী, খুনী, ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী। মানুষের জিহ্বা যখন এই পাপগুলোর যে কোন একটিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তা পৃথিবীতে নরকের আগুন জ্বেলে বসে। পবিত্র আত্মা এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন আগুনের জিহ্বার মত শিখার আকারে, প্রেরিত ২ অধ্যায়। সে কারণে জিহ্বাকে যখন স্বর্গ থেকে অবনত আগুন দ্বারা নির্দেশনা ও চালিত করা হয়, তখন তা ভাল চিন্তা, পবিত্র ভালবাসা ও আন্তরিক ভক্তি প্রজ্জ্বলিত করে। কিন্তু যখন সেই জিহ্বা নরকের আগুন দ্বারা প্ররোচিত হয়, তখন তা সৃষ্টি করে ক্রোধ, আক্রোশ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং শয়তানের স্বার্থ উদ্ধার করে এমন সমস্ত পাপ। এ কারণে আমরা যেমন আগুন ভয় পাই, সেভাবে মন্দ অভিলাষ, প্রতিযোগিতা, দর্প, ঈর্ষা, মিথ্যা, অপবাদ এবং এ ধরনের সমস্ত পাপকেও আমাদের ভয় পাওয়া প্রয়োজন ও এগুলো থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন, কারণ এগুলোর উৎপত্তি আমাদের জিহ্বা ও আমাদের আত্মা থেকেই ঘটে থাকে।

ঘ. এর পরে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, জিহ্বাকে বশে রাখা কতটা কঠিন কাজ: *কারণ সমস্ত রকম পশু ও পাখি, সরীসৃপ ও সমুদ্রচর জন্তুকে মানুষ দমন করতে পারে ও দমন করেছে; কিন্তু জিহ্বাকে দমন করতে কোন মানুষের সাধ্য নেই; সেটি অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ*, পদ ৭,৮। এখানে প্রেরিত যাকোব যা বলতে চেয়েছেন তা হয়তো অনেকটা এরকম: "সিংহ সহ অন্যান্য অনেক বন্য পশু, বিশেষ করে ঘোড়া ও উটকে মানুষ পোষ মানিয়েছে ও নিয়ন্ত্রণাধীন করতে সক্ষম হয়েছে। পাখিরাও তাদের শত চঞ্চলতা ও ছটফটানি সত্ত্বেও মানুষের হাতে বন্দী হয়েছে। এমনকি সাপেরাও তাদের ভয়ঙ্কর বিষ ও ধূর্ততা থাকা সত্ত্বেও হয়েছে নির্বিষ ও মানুষের বশীভূত। সমুদ্রে বা নদীতে যত মৎসকুল রয়েছে তা মানুষ নিজেদের আয়ত্বে এনেছে ও আহারের জন্য ব্যবহার করছে। এই সকল প্রাণীকে যে অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ বশীভূত করেছে তা নয়, যেভাবে সিংহরা ভাববাদী দানিয়েলকে আক্রমণ না করে তাঁর পোষ মেনেছিল, কাকেরা ভাববাদী এলিয়কে খাবার এনে দিয়েছিল এবং বিশাল তিমি মাছ ভাববাদী যোনাকে মুখে করে গভীর সমুদ্র থেকে তীরে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার কথা। পশু, সরীসৃপ, পাখি ও মাছেরা শুধু যে বশীভূত হয়েছে তা নয়, তাদেরকে

বশ করেছে মানব জাতি। তথাপি মানুষের জিহ্বা এই সমস্ত কিছুর চেয়ে খারাপ এবং তাকে কোনভাবেই বশে আনা যায় না। প্রাণীদেরকে বশে আনার কোন কৌশল বা শক্তি দিয়েই জিহ্বাকে বশ মানানো যায় না। স্বর্গীয় অনুগ্রহ না পেলে মানুষ কখনো তার জিহ্বাকে বশে আনতে পারে না।" প্রেরিত যাকোব বলতে চান নি যে, জিহ্বাকে বশে আনা একটি অসম্ভব ব্যাপার। বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং এর জন্য অনেক বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন, প্রার্থনা করা প্রয়োজন এবং সুশৃঙ্খলভাবে জীবন অতিবাহিত করা প্রয়োজন। অনেক সময় এসব কিছুতেও কোন কাজ হয় না; কারণ *সেটি অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ*। বন্য প্রাণীকে হয়তো নির্দিষ্ট কোন সীমার মাঝে বন্দী করে রাখা যায়, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চালানো যায়, এমনকি বি-ষধর সাপকে নিরাপদ করে তোলার জন্য তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়া যায়। কিন্তু জিহ্বা কোন নিয়ম-নীতি মানে না এবং তা যে কোন সময় যে কারও প্রতি তার বিষ ছড়াতে পারে। এ কারণে জিহ্বার প্রতি শুধু যে সতর্কতার সাথে নজর রাখা প্রয়োজন তা নয়, সেই সাথে এর ভয়ঙ্কর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৬. আমাদের জিহ্বা দিয়ে আমরা ধার্মিকতা পালনের জন্য ও আমাদের ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে পারি সে ব্যাপারে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন আমাদের এই জিহ্বা দিয়ে আমরা কখনো অভিশাপ না দিই, সমালোচনা না করি এবং কোন মন্দতা যেন এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পায়: *এই জিহ্বা দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ আদায় করি, আবার এর দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মানুষকে অভিশাপ দিই। একই মুখ থেকে ধন্যবাদ ও অভিশাপ বের হয়। হে আমার ভাইয়েরা, এই রকম হওয়া অনুচিত*, পদ ৯,১০। এ বিষয়টি কত না আশ্চর্যের যে, যারা তাদের মুখ ঈশ্বরের প্রার্থনা ও প্রশংসায় ব্যবহার করে তারাই আবার তাদের সেই মুখ মানুষের প্রতি অভিশাপ ও ভর্ৎসনা উচ্চারণ করার জন্য ইচ্ছামত ব্যবহার করে! যদি আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা হিসেবে আশীর্বাদ করি, তাহলে সেই সাথে আমাদের এটাও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আমাদের সমস্ত কথা ও কাজ এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরের প্রতিরূপ যেন আমাদের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। যে জিহ্বা স্বর্গীয় খোদার প্রশংসা ও গৌরব করে, সেই একই জিহ্বা যদি কখনো অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন কিছুর প্রতি জঘন্য ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, তাহলে সেই খোদায়ী প্রশংসা ও গৌরবের আর কোন মূল্য থাকে না। একজন মানুষ যখন খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে তখন সে তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতিরূপ ধারণ করে। কাজেই একজন বিশ্বসীকে ভর্ৎসনা করা ও অভিশাপ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা করা। এ ধরনের আচরণ কখনো কাম্য নয়। জিহ্বার কারণে মানুষের সমস্ত ধর্ম পালন অসার ও মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। ধার্মিকতা তখনই অসার ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে, যখন মানুষের অন্তরে কোন ভালবাসা থাকে না। জিহ্বা একাধারে যেমন ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে পারে, তেমনি তা ভাল মানুষের প্রতি ভর্ৎসনা ও বদদোয়ায় পূর্ণ হতে পারে। আমাদের জিহ্বাকে যদি আমরা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে তা

এভাবেই আমাদের করে তোলে ঈশ্বরের চোখে পা যীশুর ও অপরাধী। এখানে প্রেরিত যাকোব দেখিয়েছেন যে, এই জিহ্বা একই সাথে হতে পারে আমাদের জীবনের জন্য অনুগ্রহের উৎস, আবার হতে পারে আমাদের ধ্বংসের কারণ। *ফোয়ারা কি একই ছিদ্র দিয়ে মিষ্ট ও তিক্ত দু'রকম জল বের করে? হে আমার ভাইয়েরা, ডুমুরগাছে কি জলপাই ফল, অথবা আঙ্গুরলতায় কি ডুমুর ফল ধরতে পারে? নোনা জলের মধ্যে মিষ্ট জল পাওয়া যায় না*, পদ ১১,১২। প্রকৃত ধার্মিকতায় কখনো পরস্পর বিরোধী কোন ধারণার অবস্থান থাকতে পারে না। একজন সত্যিকার ধার্মিক মানুষের কথায় ও কাজে কখনো অমিল থাকতে পারে না। মানুষ যদি নিজ নিজ জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখে, তাহলে বহু পাপ ও অধার্মিকতা থেকে এই পৃথিবী মুক্ত হতে পারতো।

যাকোব ৩:১৩-১৮ পদ

এর আগে যে সমস্ত পাপের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর উৎপত্তি হয়েছে নিজেকে অন্যদের তুলনায় জ্ঞানী ভাবার কারণে। আর এখন প্রেরিত যাকোব বলতে চলেছেন এমন সব পাপের কথা যেগুলো ঘটে থাকে ভাল ও মন্দ জ্ঞানের পার্থক্য না করতে পারার কারণে।

ক. প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে কিছু কথা এখানে আমরা দেখতে পাই, যা এর চিহ্ন ও ফল দেখে আলাদা করে চেনা যায়: *তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান কে? সে সদাচরণ দ্বারা জ্ঞানের মৃদুতায় নিজের কাজ দেখিয়ে দিক*, পদ ১৩। একজন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ অত্যন্ত বিবেচনাসিদ্ধ একজন মানুষ। তিনি উপযুক্ত পরিমাণে জ্ঞান আহরণ না করে কখনোই নিজের জ্ঞান প্রকাশ করবেন না। তিনি শুধুমাত্র কিছু জিনিস জানেন বলেই নিজের মূল্যায়ন করবেন না। বরং সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মানুষের মাঝে প্রকাশ করার জন্য যথাযথ কারণ আছে বলেই তিনি তা প্রকাশ করবেন। প্রকৃত জ্ঞান চিহ্নিত করার জন্য এই দুটো বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন: কে প্রজ্ঞাবান এবং তার মাঝে জ্ঞান রয়েছে কি না। এখানে আমরা লক্ষ্য করব:-

১. একটি ভাল জীবন। যদি আমরা অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী হই তাহলে আমাদের ভাল জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তা অনেকটা প্রকাশ পাবে। সেই জীবনে কোন ভালবাসাহীনতা বা অসারতা থাকবে না। শিক্ষা দেয়, সুস্থতা দেয় এবং মঙ্গল সাধন করে, এমন কথাই জ্ঞানের লক্ষণ। যারা দেখতে সুদর্শন, কিন্তু মন্দ কাজ করে বেড়ায়, তারা কখনো স্বর্গীয় জ্ঞানে পূর্ণ হতে পারে না।

২. প্রকৃত জ্ঞান এর কাজ দেখে চেনা যায়। একজন মানুষের শুধু কথা নয়, তার কাজ তথা তার সমস্ত জীবনই তার পরিচয় বহন করে। এ কারণেই বলা হয়, মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে তার পুরোটা জীবন প্রকাশ পায়। ভাল কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান যতটা প্রকাশ পায়, ততটা কোন অসার কথা বা মতধারার মধ্য দিয়ে পায় না। যে ভাল চিন্তা করে বা সুন্দর করে কথা বলে, সে যদি ভাল জীবন যাপন না করে বা ভাল কাজ না করে, তাহলে

সুসমাচারের মতে সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়।

৩. আত্মার নম্রতার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃত জ্ঞান চিহ্নিত করতে পারি: *সে সদাচরণ দ্বারা জ্ঞানের মৃদুতায় নিজের কাজ দেখিয়ে দিক*। আমাদের নিজ নিজ ক্রোধ প্রশমনের মধ্য দিয়ে এবং অন্যদের ক্রোধের বিপরীতে নিজেদেরকে ধৈর্যপূর্বক শান্ত রেখে আমরা আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করতে পারি। নম্রতা ও জ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ধৈর্য ব্যতীত আর অন্য কোন কিছুর মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞান এতটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। যখন আমরা শান্ত ও স্থির থাকি, তখনই কেবল আমরা আমাদের যুক্তি ও বিবেচনা কাজে লাগাতে পারি এবং যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলতে সক্ষম হই। জ্ঞান নম্রতার জন্ম দেয় এবং নম্রতা জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

খ. যারা নিজেদের জ্ঞান নিয়ে গর্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তাদের প্রতি এখানে যাকোব বিশেষ বক্তব্য রেখেছেন: *কিন্তু তোমাদের অন্তর যদি ঈর্ষায় তিক্ত হয় ও স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খায় ভরা থাকে, তবে সত্যের বিরুদ্ধে গর্ব করো না ও মিথ্যা বলো না*, পদ ১৪। আমরা যদি নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ভাবি এবং মানুষের সামনে তা প্রকাশও করি, তাতেও আমাদের গর্ব করার কিছু নেই, যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান ও তাঁর মঙ্গলময়তা প্রকাশিত না হয়। যদি আমরা অনেক কথার মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করি, অনেক যুক্তির কথা বলি, অনেক ভাল ভাল কথা বলি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কোন ভালবাসা না থাকে, শান্তির মনোভাব না থাকে, যদি আমাদের অন্তরে মানুষের প্রতি আক্রোশ মনোভাব ও তিক্ততা থাকে, আমরা যদি আমাদের প্রতি অন্যায়কারীদের ক্ষমা করতে না পারি, তাহলে আমাদের আসলে গর্ব করার মত কিছু থাকে না। আমাদের মাঝে সত্যের ও ধার্মিকতার জন্য যদি তীব্র আগ্রহ থাকে, তথাপি আমরা যদি অন্যদের চেয়ে আমাদের জ্ঞান বেশি বলে তা নিয়ে গর্ব করি, আর তা করতে গিয়ে অন্যদের মাঝে বিরক্তি ও ঘৃণার সঞ্চার করি, তাহলে সেই জ্ঞান ও গর্ব আমাদের বিরুদ্ধেই জ্বলন্ত সাক্ষ্য হয়ে উঠবে এবং তা আমাদের খ্রীষ্টিয় পুরোহিতত্বের জন্য এক লজ্জার কারণ হয়ে উঠবে। আমাদের সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, মিথ্যাকে যতই সত্যের আদলে উপস্থাপন করা হোক না কেন তা আসলে মিথ্যাই থেকে যায়। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. ঈর্ষা করা ও গর্ব করা জ্ঞানের নম্রতার বিরোধী। মানুষের অন্তরে এই দুটোই অবস্থান করতে পারে। কিন্তু কখনোই নম্রতা ও গর্ব এক সাথে একই অন্তরে অবস্থান করতে পারে না। পবিত্র নম্রতা ও তিক্ত ঈর্ষা এতটাই বিপরীতমুখী যে, এ দুটোকে সরাফের আগুন ও নরকের আগুনের সাথে তুলনা করা যায়।

২. মানুষের অন্তরে প্রথমে ঈর্ষা প্রবেশ করে এবং এরপর তা দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টি করে। মানুষের এই বিভেদ ও দ্বন্দ্বের কারণেই জন্ম নেয় অসার গর্ব ও মিথ্যা, পদ ১৬। ফলে শয়তান মানুষের মধ্যে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হয়। যারা ক্রোধ, ঈর্ষা ও আত্মগর্ব নিয়ে জীবন ধারণ করে, যাদের মধ্যে দ্বন্দ কাজ করে, তারা যে কোন মন্দ কাজ করতে খুব সহজে প্ররোচিত হয়। এই ধরনের বিশৃঙ্খলতা জন্ম দেয় বহু প্রলোভনের। এতে করে

শয়তান পূর্ণ শক্তিতে মানুষকে আক্রমণ করে এবং মানুষের অন্তরে পাপবোধ ও অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে। মানুষ যখন একটি পাপ করে তখন সেই পাপ আরেকটি পাপ ডেকে নিয়ে আসে। আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, এই পাপ কতটা ক্ষতি সাধন করতে পারে। এ ধরনের জ্ঞান যে ফল তৈরি করে তাতে কি আসলে গর্ব করা যায়? এ ধরনের জ্ঞান ও গর্ব কেবল খ্রীষ্টিয় ধর্মের অবমাননাই প্রকাশ করে থাকে।

৩. যেখান থেকে এ ধরনের জ্ঞান আসে: *সেই জ্ঞান এমন নয়, যা উপর থেকে নেমে আসে বরং তা প্রার্থিব, আত্মিক নয় এবং তা শয়তান থেকে আসে*। সোজা কথায় বললে এই জ্ঞানের স্রষ্টা স্বয়ং শয়তান। পার্থিব ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের ধারক এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে শয়তানের প্ররোচণা ও পার্থিব অভিলাষ থেকে। মানুষের দৈহিক প্রবৃত্তিকে সমর্থন দেয় এই জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা মানুষ তার সমস্ত অভিলাষ ও লালসা চরিতার্থ করতে উদগ্রীব হয়। ভিন্নভাবে বললে মানুষের মধ্যকার পশুপ্রবৃত্তি, বা *psychike* জাগিয়ে তোলে এই পার্থিব জ্ঞান। সেখানে কাজ করে শুধু প্রকৃতিগত যুক্তি, কোন অতিপ্রাকৃত আলোর অস্তিত্ব সেখানে থাকে না। এই ধরনের জ্ঞান শয়তানের প্রভাবযুক্ত জ্ঞান, কারণ তা শয়তান কর্তৃক উৎসারিত হয়ে মানুষকে প্ররোচিত করে। এ কারণে যারা এ ধরনের জ্ঞানে নিজেদেরকে পূর্ণ করে তারা শয়তানের কবলে পতিত হয়।

গ. যে জ্ঞান স্বর্গ থেকে আসে সেই জ্ঞান সম্পর্কে এক চমৎকার কথা আমরা এখানে দেখতে পাই। যে জ্ঞান নরক থেকে আসে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এই স্বর্গীয় জ্ঞান: *কিন্তু যে জ্ঞান উপর থেকে আসে, তা প্রথমে পাক-পবিত্র, পরে শান্তিপ্রিয়, নম্র, সহ্যগুণ সম্পন্ন, করুণা ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, ভেদাভেদবিহীন ও ভণ্ডামীশূন্য*, পদ ১৭। এখানে লক্ষ্য করুন, প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার। মানুষ অনেক অধ্যয়ন করে বা এই পৃথিবীর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বর্গীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। বর এই জ্ঞান পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এই জ্ঞানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে:-

১. এই জ্ঞান পবিত্র, এতে কোন উচ্চাভিলাষ বা উচ্চাকাঙ্খার অবকাশ নেই যা একে কলুষিত করতে পারে। সকল প্রকার কালিমা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত এই জ্ঞান। কোন পাপ এই জ্ঞান গ্রাহ্য করে না, বরং শুধুমাত্র অন্তর ও জীবনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতাই এই জ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য।

২. যে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তা শান্তিপ্রিয়। পবিত্রতার পরেই আসে শান্তি এবং এই শান্তি পবিত্রতার উপরেই নির্ভর করে। যারা সত্যিকারের জ্ঞানী তারা শান্তি ধরে রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করেন, যেন তা কোনভাবে ভঙ্গ না হয়। শান্তি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন তা যেখানে বিঘ্ন ঘটেছে সেখানে পুনঃস্থাপন করা। রাষ্ট্রে, পরিবারে, মণ্ডলীতে, প্রত্যেক সমাজে, এবং সকলের কথাবার্তায় ও জীবনাচরণে স্বর্গীয় জ্ঞান মানুষকে করে তোলে শান্তিপ্রিয়।

৩. এই জ্ঞান নম্র। সম্পত্তি অধিকার নিয়ে বিবাদ করা এই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষকে

খেপিয়ে তোলে এমন কোন কাজ করা বা এমন কোন কথা বলা এই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নয়। এই জ্ঞান কখনো কারও মতামত শুনে উত্তেজিত হয় না, নিজের ধারণা অন্যের উপরে তার ইচ্ছার বিপরীতে চাপিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে না। তা কখনো উগ্র আচরণ করে না, কর্কশ সুরে কথা বলে এবং বদমেজাজ দেখায় না। এই সমস্ত কিছুই স্বর্গীয় জ্ঞানের নম্রতার বিপরীত চিত্র।

৪. স্বর্গীয় জ্ঞান সহ্যগুণ সম্পন্ন, *eupeithes*। যা কিছু উত্তম হতে আসে ও যা কিছু মন্দ থেকে আসে তা স্বর্গীয় জ্ঞান ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে। যা কিছু দুর্বল ও ভ্রান্তিপূর্ণ তা স্বর্গীয় জ্ঞান সহ্য করে। কিন্তু তাই বলে এই সহ্যগুণ এমন নয় যে, তা মন্দতাকে বৃদ্ধি লাভের সুযোগ দেয়। না, স্বর্গীয় জ্ঞান কখনো বিতর্কের জন্ম দেয় না। যেখানে কোন প্রশ্নের অবতারণা ঘটে সেখানে স্বর্গীয় জ্ঞান সুবুদ্ধিসম্পন্ন উত্তর দানের মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নের সমাপ্তি ঘটায়।

৫. স্বর্গীয় জ্ঞান করুণা ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, যা কিছু উত্তম ও দয়ার ধারক সেসবে পরিপূর্ণ। করুণা ও উত্তমতা দুটোই তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, যাদের মাঝে এর অভাব রয়েছে এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করতে চায়।

৬. স্বর্গীয় জ্ঞানে কোন ভেদাভেদ বা পক্ষপাতিত্ব নেই। এখানে মূল যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল *adiakritos*, যার অর্থ কোন বিচার না করা, ভেদাভেদ না করা, বা একজন ব্যক্তির উপরে আরেকজন ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়া। সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনোই ভেদাভেদ করেন না, পক্ষপাতিত্ব করেন না।

৭. যে জ্ঞান স্বর্গ থেকে আসে তাতে কোন ভণ্ডামি নেই। এর কোন ছদ্মবেশ নেই, কোন ধোঁকাবাজিও নেই। পৃথিবী যা কিছুর জ্ঞানপূর্ণ বলে মনে করে, অথচ যা প্রকৃতপক্ষে প্রবঞ্চনা ও শঠতায় পূর্ণ, এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বর্গীয় জ্ঞানে নেই। ঐশ্বরিক জ্ঞান উন্মুক্ত, সুদৃঢ় এবং সার্বজনীন। এই জ্ঞান কখনো পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, আমরা যেন সব সময় এই জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকতে পারি! প্রেরিত পৌলের মত যেন আমরাও বলতে পারি, পার্থিব জ্ঞানে নয়, বরং সরলতায় ও ঐশ্বরিক আন্তরিকতায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিয়ে আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারি।

প্রকৃত জ্ঞান শান্তিতে ধার্মিকতা-ফলের বীজ বপন করে। আর এভাবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, পদ ১৮। যা কিছু শান্তিতে বপন করা হয় তা আনন্দের ফল দান করবে। অন্যরা পার্থিব জ্ঞানের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের ফল সঞ্চয় করবে এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থে তা ব্যবহার করবে। কিন্তু আমরা যদি শান্তিতে ধার্মিকতার বীজ বপন করি তাহলে আমরা এই নির্ভরতা পেতে পারি যে, আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে না। কারণ ধার্মিকদের জন্য নূর বপন করা হয়েছে এবং তারা তাদের অন্তরে আনন্দ লাভ করবে। ধার্মিকতার কাজ শান্তি উৎপন্ন করবে এবং ধার্মিকতার কাজের এই প্রভাব হবে অনন্তকাল বিরাজমান।

যাকোবের লেখা পত্র

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব, ক. বিবাদের কিছু কারণ এবং এর পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা বিগত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই সব বিষয় থেকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে, পদ ১-৫। খ. এই পৃথিবীর মন্দ বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকার বিষয়ে শিখতে পারব, পদ ৪-১০। গ. অপরের নিন্দা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার প্রবণতা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে, পদ ১১, ১২। ঘ. চিরস্থায়ী অনুগ্রহের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিচালনা অনুযায়ী চলা, পদ ১৩ থেকে উক্ত অধ্যায়ের শেষ পদ পর্যন্ত।

যাকোব ৪:১-১০ পদ

বিগত অধ্যায়ে একে অন্যের সাথে বিরোধ এবং একে অপরের হিংসা করার বিষয়ে বলা হয়েছে, এটি একটি হিংসা ও বিবাদের বিফল ফোয়ারার মত। এই অধ্যায়ে পৃথিবীর মন্দ বিষয়ের জন্য কামনা, জাগতিক বিষয় নিয়ে আনন্দ করা এবং এই সব বিষয়ের সঙ্গে অধিক সম্পর্ক স্থাপনের ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই বিষয়টি এমনই যে বিরোধ এবং বিবাদকে চরম লজ্জাজনক অবস্থায় নিয়ে যায়।

ক. পত্র লেখক এখানে যিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্টানদের তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ এবং তাদের মন্দ কামনা-বাসনার জন্য সৃষ্ট বিরোধের জন্য তিরস্কার করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কোথা থেকে যুদ্ধ এবং কোথা থেকে ঝগড়া উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ যে সব সুখ-াভিলাষ যুদ্ধ করে, সে সব থেকে কি নয়?" পদ ১। যিহূদী জাতির লোকেরা অত্যন্ত বিদ্রোহ প্রবণ। আর এই জন্য রোমীয়দের সঙ্গে তারা বার বার বিরোধে জড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া তারা ছিল বেশ কলহ প্রিয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী লোক। এই সব কারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ শুরু হত। তাদের মধ্যে অনেক ভ্রষ্ট খ্রীষ্টিয় ছিল যাদের অনৈতিক জীবন এবং মন্দ স্বভাবের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। তাতে মনে হয় যে তাদের এই সব মন্দ বিষয়ের জন্য তাদের মধ্যে খুব একটা অনুশোচনা ছিল না এবং এটাই সহজেই তাদের মধ্যে বিরোধ তৈরি করত। এই জন্য আমাদের পত্র লেখক বলেছেন যে, তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ এবং ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হত তা তাদের ঈশ্বরের প্রতি গভীর সম্মান দেখানোর

জন্য কিংবা দেশের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য দেখানোর জন্য হতো না। কিন্তু এই সব কিছুর কারণ হলো তাদের মন্দ কামনা-বাসনা। আমরা এখানে লক্ষ্য করি, যা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্যকে বাধা প্রদান করে তা হল মানুষের অহংকার, অন্যের ক্ষতি করার মনোভাব, লোভ লালসা, উচ্চাভিলাস, প্রতিহিংসা। যিহূদীরা রোমীয় জাতির দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। তারা অনাবশ্যকভাবে নিজেদের বিরোধের সাথে জড়িয়ে ফেলত। এতে তাদের মধ্যে যে ছোট ছোট দল ছিল তাদের পরিচালনার পদ্ধতি পরিবর্তন করত। এবং এতে তাদের সাধারণ শত্রুদের সাথে বিরোধ এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হত। যদিও তারা কখনো কখনো এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসত এবং সাধারণভাবে দেখলে মনে হত যে, তাদের অবস্থা ভাল পর্যায়ে রয়েছে। তারা তাদের কর্মপদ্ধতি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করত বটে কিন্তু এসব তাদের ভ্রান্ত নীতির কারণে সৃষ্টি হত। তাদের মধ্যে যেসব বিবাদ ও বিরোধের উৎপত্তি হত এবং তাতে নিজেদের লিপ্ত করত তা তাদের পার্থিব এবং মাংসিক কামনা-বাসনা থেকে জন্ম হত। কিন্তু কেউ কেউ এই সব লোভ লালসা এবং কামনা-বাসনাকে বশীভূত করার বিষয়ে অনেকে কথা বলতে পারে।

ক. বিরোধ এবং বিবাদ না থাকলেও তারা তা সৃষ্টি করত। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং হিংসার মনোভাবের কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে বিবাদের সৃষ্টি হত এরপর তা ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত জাতির মধ্যে। তাদের একে অন্যের সাথে যে বিবাদ এবং বিরোধ তা ছিল বিবেক এবং অনৈতিকতার মধ্যে এবং এছাড়া এই বিবাদ ছিল একটি মন্দ স্বভাবের সাথে আর অন্য একটি মন্দ স্বভাব। তাদের সৃষ্টি হওয়া এই সব ঝগড়া বিবাদ একে অপরের মধ্যে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। একজনের জীবনের এই অবস্থা কথা বিবেচনা করে আমরা কি এই কথা বলতে পারি না যে, ঝগড়া এবং হিংসার মনোভাব তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর মধ্যে রয়েছে তা বিশ্বাসীদের মন্দ কামনা-বাসনা থেকে সৃষ্টি হওয়া বিরোধ থেকে এসেছে? কর্তৃত্ব করার এবং ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা থেকে এবং ভোগ বিলাস ধনী হবার আকাঙ্খা থেকে কিংবা অল্প হোক, বেশি পরিমানেই হোক এই সব মন্দ কামনা-বাসনা থেকে সমস্ত বিরোধ এবং ঝগড়া সৃষ্ট হয় যা সারা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর সমস্ত বিরোধ এবং ঝগড়া আমাদের নিজেদের অন্তরের এবং স্বভাবের মন্দ কামনা এবং লোভ থেকে বের হয়ে আসে। এই জন্য গাছকে নির্মূল করতে হলে যেমন করে কুঠার দিয়ে গাছের শিকরে আঘাত করে উপড়ে ফেলতে হয় ঠিক তেমনি ঝগড়া বিবাদের প্রতিরোধ করার জন্য ঝগড়া বিবাদের শিকড় উপড়ে ফেলে ধ্বংস করতে হবে। এতে ঝগড়া বিবাদ দূর হয়ে যাবে। বিশ্বাসীদের মধ্যে যে মন্দ কামনা-বাসনা সৃষ্টি হয় তা সংযমের দ্বারা জয় করতে হবে।

খ. তাদের এই সব কামনা-বাসনাকে দমন করতে পারত না বলে তাদের মনে হতাশা এবং নিরাশার সৃষ্টি হত। “তোমরা অভিলাষ করছো, কিন্তু পাও না, খুন করছো ও ঈর্ষা করছো, কিন্তু যা চাও তা পাও না”, পদ ২। তোমরা তোমাদের মধ্যে বড় বড় বিষয়গুলো পাওয়ার জন্য লোভ করছো। তুমি একথাও ভাবছো যে, রোমীয় জাতির উপর বিজয় লাভ করার দ্বারা অথবা তোমাদের মধ্যে যে সব দল আছে তাদের দমন করার দ্বারা তোমরা এই সব

অর্জন করবে। তোমরা মনে করছো যে, তোমাদের মনে যে তীব্র আকাঙ্খা আছে তা দ্বারা তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে মহা সুখ আর আনন্দকে নিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু হায়, যখন তোমরা যে সময় এই আকাঙ্খা এবং উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার তৎপর হয়ে ওঠো তখন তোমরা হয়তো জান না যে, তোমরা তোমাদের শক্তি অপচয় করে থাক এবং তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। আর ফলহীন বিষয়ের জন্য তোমাদের রক্তপাত ঘটে। অনেক বেশি আকাংখা করার জন্য হয় তারা হতাশা এবং নিরাশাগ্রস্থ হয় অথবা যা তারা অর্জন করে বা যা কিছু তাদের আছে তাতে তারা সন্তুষ্ট হয় না। এখানে একটি কথা রয়েছে তোমরা অভিলাষ করছো, কিন্তু পাও না। এই 'পাও না' কথার অর্থ হলো সুখের জন্য তীব্র আকাঙ্খা এবং চেষ্টা করেও তা না পাওয়া। এখানে লক্ষ্য করুন, পার্থিব এবং মাংসিক কামনা-বাসনা এমনই যে, যা মনকে পরিতৃপ্ত কিংবা সন্তুষ্ট করতে পারে না।

গ. পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং পাপ কাজের প্রতি আগ্রহ সাধারণত ঈশ্বরের জন্য আমাদের কাছের আকাঙ্খাকে এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনার ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্থ করে: "তোমরা ঝগড়া ও যুদ্ধ করে থাক, কিন্তু কিছু পাও না। তোমরা ঝগড়া ও বিবাদ করছো কিন্তু সফল হতে পারছো না। কারণ ঈশ্বর এই সব বিষয় অনুমোদন করবেন কিনা সেই বিষয়ে পরামর্শ চাওয়ার জন্য তোমরা ঈশ্বরের কাছে, যিনি তোমাদের যত্ন নিয়ে থাকেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করো না। সমস্ত কাজের ভার তার কাছে অর্পণ কর না এবং তাঁর কাছে তুমি তোমার এই সব কাজের জন্য নম্র হয়ে বিনতী কর না কিন্তু তুমি তোমার নিজের মন্দ উদ্দেশ্য এবং মন্দ প্রবৃত্তি পূরণের জন্য এগিয়ে চলছো। আর এই জন্য তোমরা বার বার হতাশা এবং নিরাশার মধ্য দিয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছো।

ঘ. তোমাদের প্রার্থনা, তোমাদের মন্দ কামনা-বাসনার জন্য গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। যখন তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর তখন ঈশ্বরের কাছে সেই সব প্রার্থনা ঘৃনিত রূপে উপস্থাপিত হয়, পদ ৩। "যাচঞা করছো, তবুও ফল পাচ্ছ না; কারণ মন্দ ভাবে যাচঞা করছো, যেন নিজ নিজ সুখ বিলাসে ব্যয় করতে পার। এই আয়াতের অর্থ এই ভাবে করা যেতে পারে, "যদি ও একথা মনে হতে পারে যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের উপরে পূর্ণ বিজয় লাভের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুযোগকে আরও উষ্ণ এবং এর সদ্ব্যবহার করতে চাও। এছাড়া তুমি এমন ভাবে প্রার্থনা করে থাক যে, হয় তোমাদের আত্ম সন্তুষ্টির জন্য অথবা অন্যদের দেখাবার জন্য যে ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত বিশ্বাস। কিন্তু অহংকার, নিজেকে বড় করে দেখাবার প্রবণতা, ভোগবিলাস, কামনা, তোমাদের কাজের মধ্য দিয়ে এই সব প্রকাশ পাচ্ছে। তোমাদের প্রার্থনা কেবল নিজেদের স্বার্থের জন্য করে থাক। তোমরা চাইছো যেন তোমরা মহা শক্তিশালী হতে পার এবং ভোগ বিলাসের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে পার। তোমরা তোমাদের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য এবং কামুকতার জীবনকে সমৃদ্ধশালী কর, কিন্তু এভাবে তোমরা তোমাদের উপাসনা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত লজ্জাজনক উপাসনা। আর এভাবে তোমাদের অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং চরম ভন্ডামীপূর্ণ প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করছো। আর এই সব কারণে তোমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর কবুল না করে তা প্রত্যাখ্যান করছেন।" এখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে,

আমাদের যাবতীয় পার্থিব বিষয় পরিচালনার জন্য এবং এই সব বিষয়ের উপর সফলতার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমরা যে প্রার্থনা করি তাতে দেখতে হয় আমাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য যেন সঠিক থাকে।

যখন মানুষ তাদের পার্থিব কর্মকাণ্ডগুলো পালন করে (মনে করা যেতে পারে যে, তারা হয়তো কেউ দোকানদার বা কৃষক, আর যদি তারা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করে যে, ঈশ্বর তাদের যেন সৌভাগ্য দান করেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তারা তাদের কাঙ্খিত সৌভাগ্য লাভ করতে পারছে না, তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা ভুল লক্ষ্যে এবং উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে। তারা তাদের আশা এবং যে কাজ তারা করছে যেন তা সফল হয় এই জন্য তারা প্রার্থনা করে। কিন্তু এই প্রার্থনা এমন নয় যে, এর দ্বারা তারা স্বর্গীয় পিতাকে গৌরব প্রদান করছে। কিন্তু প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের চাওয়ার কাজটি এমনই যে, "যেন তারা নিজ নিজ সুখাবিলাসে ব্যয় করতে পারে।" যাতে তারা আরও উত্তম খাবার খেতে পারে, উত্তম পানীয় পান করতে পারে, আরও উন্নত মানের পোষাক পরতে পারে। আর এভাবে তারা তাদের অহংকার, অসার কাজ এবং ভোগবিলাসকেই গৌরবান্বিত করে। কিন্তু যদি আমরা এভাবে এই পৃথিবীর জিনিষ এবং পার্থিব বিষয়গুলো পেতে চাই তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন। কারণ এই বিষয়ে প্রার্থনাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। অন্য দিকে যদি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, হয় আমরা যা চাইছি তা তিনি আমাদের দেবেন, অথবা যদি তা নাও পাই তাহলে আমরা যাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি সেই হৃদয় তিনি আমাদের দেবেন। আর আমরা যাতে অন্য কোন উপায়ে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি সেই সুযোগ এবং উপায় তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন আমরা আমাদের প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার কারণ হলো আমরা সঠিক উদ্দেশ্যে অথবা সঠিক নিয়মে ঈশ্বরের কাছে চাই নি। অথবা আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বা গভীর ভক্তির সাথে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি নি। সন্দেহ যুক্ত এবং উদ্দেশ্যহীন প্রার্থনা ঈশ্বর অস্বীকার করেন। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার চেয়ে যদি আমরা আমাদের পার্থিব কামনা-বাসনার কথা প্রার্থনার সময় বেশি বলি তাহলে সেই প্রার্থনার মাধ্যমে যা কিছু চেয়েছি তার কিছুই পাব না।

খ. এই পৃথিবীর যে সমস্ত অপরাধযুক্ত কাজ আছে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার বিষয়ে আমাদের পরিষ্কারভাবে সতর্ক করা হয়েছে: "হে ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিনীরা, তোমরা কি জান না যে পৃথিবীর সাথে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা" পদ ৪। পার্থিব লোকদের এখানে ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিনী বলা হয়েছে। যখনই এই পৃথিবীর বিষয়ের প্রতি তারা গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে তখনই তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। লোভ লালসাকে কোথাও কোথাও প্রতিমা পূজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে এই লোভ লালসাকে ব্যভিচার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এমনই যে, এটা পরিত্যাগ করা উচিত। তা না করে বরং তারা এই সব বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে, এই সব বিষয়ের প্রতি সমর্থন করে এবং পার্থিব বিষয়কে শক্ত করে ধরে রাখে। যারা সাংসারিক বিষয়ে গভী-

রভাবে আসক্ত তারা এই কলঙ্কজনক ব্যাখ্যা পরিহার করছে, আর এই সব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা। একজন মানুষের উপযুক্ত এবং উত্তম উত্তম জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের ভালবাসার মধ্যে যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যে পার্থিব বিষয়গুলো হৃদয়ে ধরে রাখে, যে এই সব বিষয়ের মধ্য দিয়ে সুখ পেতে চায়, যে এই পার্থিব বিষয়ের উপর বশ্যতা স্বীকার করবে এবং এই রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে। এটি আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত ঈশ্বরের সিংহাসনে পার্থিব বিষয়সমূহ স্থাপন করার জন্য ঈশ্বরের প্রবল বিরোধিতা করা এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করার সামিল। "অতত্রব যে কেউ পৃথিবীর বন্ধু হতে বাসনা করে, সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে। যে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করবে, পার্থিব সুখ ও ভোগ বিলাসকে ধরে রাখতে চেষ্টা করবে এবং এই সব বিষয়ের প্রতি বন্ধুত্ব চলমান রাখবে, কিন্তু তার ক্ষমতা এবং কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে অসমর্থ হয় তাহলে সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে। "কোন ব্যক্তি একই সময়ে ঈশ্বরের এবং ধন, এই দুইয়ের দাসী করতে পারে না" মথি ৬:২৪। এখান থেকেই যুদ্ধ এবং ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এমনকি ব্যভিচার সম্বন্ধীয় এবং প্রতিমা পূজা বিষয় সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি ভালবাসা এবং ঐ সব বিষয়ের সেবা করার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ এবং ঝগড়ার উৎপত্তি হয়। যেখানে ঈশ্বরের প্রতি অনেক দিন যাবৎ শত্রুতার মনোভাবকে ধরে রাখা হয় সেখানে কি শান্তি বিরাজ করতে পারে? অথবা কে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে এবং তাঁকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে? অত্যন্ত গুরুত্বে সঙ্গে তোমরা যদি চিন্তা কর, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, এই পৃথিবীর সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পার না। পৃথিবীর সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। কারণ এটি অবশ্যই তোমার মনকে ঈর্ষা দিয়ে পূর্ণ করে রাখবে মন্দ বিষয়ের প্রতি প্রবল আসক্তি দিয়ে পূর্ণ করে রাখবে। এটি হল পৃথিবীর অতি সাধারণ অবস্থা। "তোমরা কি মনে কর যে, পবিত্র শাস্ত্র বৃথাই বলেছে যে, তিনি যে আত্মা বাস করিয়েছে তার জন্য ঈশ্বর জন্য আকাঙ্খা করেন?" পদ ৫। পবিত্র শাস্ত্রে মানুষের মনের স্বভাব সম্বন্ধে এই বিবরণ দিয়েছে যে, তার অন্তরের সব চিন্তা ভাবনা সব সময়ই কেবল মন্দের দিকে ঝুঁকে আছে, আদিপুস্তক ৬:৫। সাধারণ পাপগুলো প্রধানত ঈর্ষার মধ্য দিয়ে তার স্বভাবকে প্রকাশ করে এবং অবিরতভাবে এই ঈর্ষার প্রবণতার দিকেই ধাবিত হয়। মানুষের মধ্যে যে স্বভাব বাস করে তা সব সময় একটির পর একটি মন্দ বিষয়ের জন্ম দেয়। মন্দ বিষয়গুলোকে আমরা একটির সঙ্গে অন্যটির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হতে দেখি। যা মানুষকে আনন্দ দেয় এবং যা কিছু তাদেরকে অভিভূত করে সেই সব বিষয় পাওয়ার জন্য মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখন, এই পৃথিবীর পথ, জাঁকজমক এবং ভোগবিলাসিতার ফল, যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং এই সমস্ত পার্থিব বিষয় লাভ করার জন্য ঝগড়া বিবাদ করা। এই সব কিছু জগতকে বন্ধু বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। কারণ মনের দিক থেকে এক না হলে কখনোই বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে না। এই জন্য বিশ্বাসদানদের ঝগড়া বিবাদের প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। তাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, তারা অত্যন্ত উন্নত আর আত্মা তাদের হৃদয়ে বাস করছে। আর যদি আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হই তাহলে এই জগত আমাদের জীবনের কাছে যে সমস্ত

জিনিস স্বাভাবিকভাবে দিয়ে থাকে তার চেয়ে তার চেয়েও অনেক বেশি আমরা লাভ করতে সক্ষম হব। পৃথিবীর প্রকৃত লোকদের বদমেজাজী হতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু ঈশ্বর তাদের এই শিক্ষা দান করেন যেন তারা উদারতাপূর্ণ মানুষ হতে পারে। পৃথিবীর প্রকৃতি এই শিক্ষা দেয় যেন আমরা কল্পনা প্রিয় মানুষে পরিণত হই। যাতে আমরা কেবল নিজেদেরকেই সবচেয়েই ভাল জিনিস দিয়ে সিঞ্চিত করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর যে শিক্ষা দেন তা হল আমরা যেন আমাদের জীবনের জন্য যা কিছু অতি প্রয়োজনীয় কেবল সেই সব জিনিস পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক থাকি এবং অন্যরা যাতে আরামে এবং সাচ্ছন্দে থাকতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখি। এছাড়া তিনি আরও শিক্ষা দেন যেন আমরা আমাদের চারপাশে যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন সাধ্য অনুযায়ী ভাল কাজ করি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে পৃথিবীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই যদি আমরা সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের বন্ধু হতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার প্রবণতা কিংবা ইচ্ছা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। আমাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক যে প্রকৃতি বা স্বভাব রয়েছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা সংশোধন করবেন এবং তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে যত্ন করবেন। ঈশ্বর যেখানে অনুগ্রহ বর্ষন করেন সেখানে তিনি এমন স্বভাব প্রদান করেন যা পৃথিবীর স্বভাবের চেয়ে ভিন্ন।

গ. ঈশ্বর অহংকার এবং নম্রতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা যেন এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি আমরা তা এখান থেকে শিখব। "ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন এবং নম্রদের অনুগ্রহ দান করেন" পদ ৬। এখানে যে পদটি উল্লেখ করা হয়েছে তা পুরাতন নিয়মের একটি পদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। একইভাবে উদ্ধৃতি দেখতে পাই গীতসংহিতা শরীফে। সেখানে লেখা আছে, "কেননা তুমি দুঃখীদেরকে নিস্তার করবে, (যদি তাদের অন্তর তাদের অবস্থার জন্য নিবেদিত থাকে), কিন্তু গর্বিত নয়ন অবনত করবে, গীতসংহিতা ১৮:২৭। আর মেসাল পুস্তকে লেখা আছে, "তিনি নিশ্চয়ই নিন্দুকদের নিন্দা করেন, কিন্তু নম্রদের অনুগ্রহ প্রদান করেন," মেসাল ৩:৩৪। এখানে দুটো বিষয় লক্ষ্যনীয় বিষয় রয়েছে:

১) অহংকারের কারণে অসম্মান আসে। কিন্তু ঈশ্বর তা প্রতিরোধ করেন। এর প্রকৃত শব্দ হল antiassetai, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিজেকে দাঁড় করান। যখন কোন লোক নিজেকে ঈশ্বরের একজন বিদ্রোহী এবং তাঁর একজন শত্রু বলে ঘোষণা দেয়, তাঁর মুকুট এবং মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চায়, আর সে যদি তাঁর এই কর্মকাণ্ড ক্রমাগত চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে এর চেয়ে ঈশ্বরের জন্য অসম্মানজনক আর কি হতে পারে? অহংকার ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট থাকে। সে তার জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সত্যকে প্রতিরোধ করে, তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সে ঈশ্বরের সত্যকে বাধা প্রদান করে, সে তার দৃঢ় সংকল্প দিয়ে ঈশ্বরের আইনকে প্রতিরোধ করে, সে তাঁর ক্ষমতা দিয়ে মানুষের এবং সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের যত্ন নেবার কাজকে প্রতিরোধ করে। সুতরাং ঈশ্বর অহংকারের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অহংকারের প্রকৃতি হল ঈশ্বরের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া। কিন্তু ঈশ্বর অহংকারের প্রতিরোধ করেন। ঈশ্বর যাকে তাদের শত্রু হিসেবে তৈরি করেছেন তাদের পূর্ব অবস্থার কথা কে বর্ণনা করতে পারে? তাদের অন্তর যেভাবে অহংকার

দিয়ে পূর্ণ করে রাখে ঠিক সেইভাবে (শীঘ্র অথবা পরে) তাদের নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করবেন। যদি আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের জীবনে লাভ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের অহংকারের প্রতিরোধ করতে হবে।

২) নম্রতাকে ঈশ্বর সম্মান এবং সাহায্য করে থাকেন। অনুগ্রহ যেমন করে অসম্মানকে প্রতিরোধ করে তেমনি করে নম্রতার জীবনকে ঈশ্বর সম্মান প্রদান করেন। ঈশ্বর যেখানে নম্র হওয়ার জন্য অনুগ্রহ দান করেন সেখানে অবশ্যই ঈশ্বর অন্যান্য অনুগ্রহ দান করবেন, ৬ষ্ঠ পদের প্রথমেই যেমন লেখা আছে, "তিনি আরও অনুগ্রহ দান করেন।" ঈশ্বর যেখানে প্রকৃত অনুগ্রহ দান করেন সেখানে তিনি আরও অনুগ্রহ দান করে থাকেন। কারণ অন্তরে উত্তম আকাঙ্খা রয়েছে বলে সেখানে তিনি অনুগ্রহ দান করেন সেখানে আরও অনেক অনুগ্রহ দান করবেন। তিনি নম্রতার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, কারণ তারা দেখতে পায় যে, তাদের এর প্রয়োজন রয়েছে, তারা এর জন্য আকাঙ্খী এবং এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে, এই কারণে,

ঘ. আমরা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার বিষয় শিখব: "অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও, আর শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাতে সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, পদ ৭। বিশ্বসীগণকে পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করতে হবে, এবং যে হিংসা এবং অহংকার যা তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যপ্ত হয়ে থাকতে দেখে তার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে তাদের আত্মসমর্পনের জন্য তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব করতে শিখবে। "একজন রাজার কাছে প্রজা যেমন করে তার কাজের মাধ্যমে নিজেকে সমর্পন করে ঠিক তেমনি করে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে এবং একজন বন্ধু অন্য বন্ধুকে ভালবাসে এবং তার প্রতি আকর্ষিত থাকে তেমনি তার প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং আকর্ষণ থাকতে হবে। "তুমি তোমার সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি ঈশ্বরের সত্যের কাছে সমর্পণ কর, তোমার সমস্ত ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, একইভাবে তাঁর আদেশ পালন করতে সচেষ্ট হও এবং তোমার মঙ্গলের জন্য তিনি যে সব বন্দোবস্ত করেছেন তাঁর জন্য তার কাছে সমর্পিত হও।" আমরা প্রজা তাঁর অধীন তাই অবশ্যই তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। কেবল ভয়ের দৃশ্য দিয়ে নয় কিন্তু তা ভালবাসার মধ্য দিয়ে, কেবল মূল্যের জন্য নয় কিন্তু বিবেকের জন্যও বটে। "যত রকম উপায় আছে তার মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পন করতে হবে। আর এই সুযোগটি ব্যবহার করার মাধ্যমে তোমরা দেখতে পাবে যে, অনেক লাভবান হয়েছ। কারণ ঈশ্বর তোমার উপরে তাঁর শাসন ক্ষমতা চালিয়ে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করবেন না।"

এভাবে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করার ফলে যে অনুগ্রহ আমরা পাব তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং আমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য শয়তান তৎপর হয়ে উঠবে, এটা খুব স্বাভাবিক। তাই এখন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন দৃঢ়তার সঙ্গে শয়তানের সমস্ত উদ্যোগের প্রতিরোধ করতে পারি। যদি সে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং দয়া দানের বিষয়ে আমাদের দূরে রাখার জন্য বিনীতভাবে কিংবা দৃঢ়তার সঙ্গে কোন পরামর্শ প্রদান করেন, যদি আমরা শয়তানের প্ররোচনায় পতিত হই তাহলে অত্যন্ত দুঃখ

এবং কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। আর এতে আমাদের লজ্জা পেতে এবং সমস্যাগ্রস্থ হয়ে পড়তে হবে। আমাদের অবশ্যই এই সব ভয়ের চিহ্ন এবং ইঙ্গিতগুলোকে প্রতিহত করতে হবে। যদি সে আমাদের বাহ্যিক শান্ত ভাবকে এবং পার্থিব বড় বড় পদগুলো প্রাপ্তির বিষয়কে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করা হয়েছে বলে দেখতে চায় তাহলে আমাদের অবশ্যই শয়তানের অহংকার এবং অলসতাকে, সমস্ত কাজ এবং পরামর্শগুলো প্রতিহত করতে হবে। আমাদের যে কোন দুঃখ কষ্ট এবং হতাশা এবং যন্ত্রনার পরিস্থিতিকে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যত্নশীলতা বলে মনে করার জন্য নিজেকে প্রলুব্ধ করতে হবে। এই কারণে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করার মধ্য দিয়ে আমাদের এই সব এড়িয়ে যেতে হবে। যা কিছু আমাদের অন্তরে রাগের সৃষ্টি করে সেই সব বিষয়কে প্রতিহত করতে হবে। শয়তান তোমাদেরকে আমন্ত্রণ করে যেন বশীভূত করতে না পারে সেজন্য “তোমরা শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাতে সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।” যদি আমরা প্রলোভনের কাছে বশীভূত হই তাহলে শয়তান অবিরতভাবে আমাদের আক্রমণ করে যাবে। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিধান করি এবং শয়তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, তাহলে সে আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। প্রলোভনের বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ এবং অর্গলবদ্ধ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হতে হবে।

ঙ. ঈশ্বরের বাধ্য থাকার জন্য তিনি আমাদের যে কাজ করতে বলেছেন এবং যে নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে, পদ ৮-১০।

১) “ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও।” যে অন্তর ঈশ্বরের বিদ্রোহী সে অন্তরকে অবশ্যই ঈশ্বরের পায়ের কাছে নিয়ে আসতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধ থেকে এবং তাঁর সাথে কথা বলার জীবন থেকে যে লোক নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে কিংবা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে: “ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও। ঈশ্বরের এবাদতে এবং তাঁর নিয়ম কানুন পালনের জন্য এবং তাঁর সমস্ত কাজে অংশগ্রহনের জন্য তোমার প্রয়োজন রয়েছে। ”

২) তোমাদের হাত পাক-পবিত্র কর। যে কেউ ঈশ্বরের কাছে আসতে চায় তাকে অবশ্যই হাত পাক-পবিত্র করতে হবে। এই জন্য পৌল নির্দেশ দিয়েছেন, “কোন রকম ক্রোধ এবং বিতর্ক ছাড়াই পবিত্র হাত তুলে প্রার্থনা করুক,” (২ তীমথিয় ৮)। রক্তপাত করা থেকে এবং ঘুষ গ্রহণ করা থেকে হাত মুক্ত রাখতে হবে এবং যা কিছু অন্যায্য এবং নিষ্ঠুরজনক তা থেকে এবং সমস্ত রকম পাপের অপবিত্রতা থেকে হাত মুক্ত রাখতে হবে: যে পাপের অধীন দাস সে কখনোই ঈশ্বরের অনুগত হতে পারে না। নতুবা প্রার্থনার জন্য নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করার কাজটি নিরর্থক হিসেবে গনিত হবে। এছাড়া উপাসনার জন্য আমরা যা কিছুই করি, তার জন্য মূল্য থাকবে না।

৩) দ্বিমনা লোকের অন্তর অবশ্যই বিশুদ্ধ করতে হবে। যারা ঈশ্বর ও পৃথিবীর মাঝে থেকে ইতঃস্তত করে, কোন্ দিকে যাবে, কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, তারাই হল দ্বিমনা লোক। এখানে সে কথাই বোঝানো হয়েছে। হৃদয়কে বিশুদ্ধ

করার জন্য সরল হতে হবে, এই একটি মাত্র লক্ষ্য এবং নীতিতে কাজ করতে হবে, জগতে অন্য কোন কিছু অনুসন্ধান করার চেয়ে বরং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। কপটতা থাকলে বুঝতে হবে সেই অন্তর খাঁটি নয়। কিন্তু যারা সঠিকভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করে তাদের অন্তর বিশুদ্ধ হবে ঠিক যেমন করে তাদের হাত পরিস্কৃত হয়েছে।

৪) মাতম কর, শোকার্ত হও, এবং কাঁদ। "যে দুঃখ কষ্ট অন্যদের গ্রহণ করার জন্য পাঠাবেন সেভাবে তোমার জন্যও দুঃখ কষ্ট পাঠাবেন এবং যথাযথভাবে এই সব উপলব্ধি করতে হবে। যখন তোমার উপর কষ্ট পাঠানো হবে তুমি সেই কষ্টকে গ্রহণ করো এবং এই দুঃখ কষ্টকে গ্রহণ করো এবং এই দুঃখ কষ্টকে অবজ্ঞা করো না। অথবা যাদের উপরে দুঃখ কষ্ট নেমে আসে তুমি তাদের জন্য তোমার সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর দিয়ে দুঃখ প্রকাশের মধ্যে এবং ঈশ্বরের মন্ডলীর ক্লেশগুলো নিজের অন্তরে স্থাপন করবে। তোমাদের নিজেদের পাপ এবং অন্যদের পাপের জন্য বিলাপ করতে হবে। বিবাদ এবং বিরোধের সময় বিলাপ করতে হবে। আর পাপ যা ঝগড়া ও বিরোধের কারণে সৃষ্ট এর জন্য বিলাপ করতে হবে। "তোমাদের হাসি শোকে আনন্দে ও বিষাদে পরিণত হোক।" দুঃখের ভবিষ্যদ্বাণী অথবা খুব সমস্যাপূর্ণ অবস্থার সমাধানের উপায় দেখিয়ে দেওয়ার মত বিষয়কে বুঝাবার জন্য এই অংশ নেওয়া হয়েছে। মানুষকে তাদের উপর নেমে আসা দুঃখ কষ্টকে অনিবার্য বলে মনে করতে হবে। এমনকি ঈশ্বর নিজেও তাদের উপর এই সব দুঃখ কষ্ট নিয়ে আসতে পারেন। কেউ হয়তো বা উচ্চস্বরে হাসতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি তাদের সেই হাসিকে বিষাদে পরিণত করতে পারেন। উদাসীন বিশ্বাসীদের জীবনের ভীতিকর অবস্থা থাকতে পারে ভেবে যাকোব এটি লিখেছেন। এই জন্য তাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন তাদের কোন কিছু খুব মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হয়, তাদের অসার আমোদ প্রমোদ এবং ইন্দ্রিয় সুখের সমস্ত কাজগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে, যেন তারা ঈশ্বরের গ্রাহ্যণীয় নম্রতার মধ্য দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে এবং অনুতাপ সহকারে ক্রন্দন করে।

৫. "প্রভুর সাক্ষাতে নত হও"। আত্মার আভ্যন্তরীণ কাজকে দুঃখ কষ্ট দুর্দশা এবং যন্ত্রণাকর অবস্থার বহিঃপ্রকাশ করার জন্য উপযোগী করতে হবে। এখানে আত্মার নম্রতা আবশ্যক। যিনি মানুষের দিকে প্রধানত দৃষ্টি দেন তাঁর সামনে নত হতে হবে। আমাদের জীবনে যে সব মন্দ বিষয় রয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, যা কিছু উত্তম সেই সব কাজ করার মধ্য দিয়ে আমাদের নম্রতাকে প্রকাশ করতে হবে: *নিজেকে নত কর*।

৬. ঈশ্বরের প্রতি যে করণীয় আমাদের রয়েছে এ সম্পর্কে আমাদের উদ্দেশ্যে অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলা হয়েছে। "ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও তাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন," পদ ৮; এবং "প্রভুর সাক্ষাতে নত হও তাতে তিনি তোমাদের উন্নত করবেন," পদ ১০। যা তাদের ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে তা হল তাদের নম্রতা। এই নম্রতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এলে তারা তাঁর করুণা লাভ করবে। বিশ্বাস, আস্থা এবং বাধ্যতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে হবে, তাহলে ঈশ্বরের তাদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের নিকটবর্তী হবেন। যদি ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগাযোগ না থাকে, তাহলে এটি হবে আমাদের দোষ, ঈশ্বরের নয়।

তিনি নম্রদের উন্নত করবেন। ঈশ্বর স্বয়ং এ সম্পর্কে আরও ঘোষণা করেছেন, "যে কেউ নিজেকে নত করে তাকে উঁচু করা হবে," মথি ২৩:১২।

যদি আমরা ঈশ্বরের সামনে সত্যিকারভাবে নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হই এবং নম্র হই, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের জীবনে তাঁর দয়ার কাজ দেখতে পাব। তিনি আমাদের সমস্ত অমঙ্গল থেকে মুক্ত করে উন্নত করবেন অথবা আমাদের জীবনে যে অমঙ্গল আমাদের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা দূর করে দিয়ে আমাদের শান্তিতে ও স্বস্তিতে রাখবেন। তিনি এই পৃথিবীতে সম্মান এবং নিরাপত্তা দিয়ে আমাদের উন্নত করবেন। অথবা আমাদেরকে স্বর্গের পথে চালিত করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে উন্নত করবেন। এভাবে আমরা আমাদের অন্তর এবং প্রভুর প্রতি আসক্তিকে পৃথিবীর উপরে তুলে ধরতে পারব। যার অন্তর নম্র, ঈশ্বর তাকে নতুন জীবন দান করেন, যিশাইয় ৫৭:১৫। তিনি নম্র লোকদের অন্তরের ইচ্ছার কথা শুনে থাকেন, গীতসংহিতা ১০:১৭। অবশেষে তিনি তাদের উন্নত করে মহিমান্বিত করবেন। ঈশ্বরকে যথাযথভাবে সম্মান দেখানো হল নম্রতা। এই পৃথিবীর যে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সামনে অকপটে নম্রতা প্রকাশ করবে, তাকে স্বর্গের সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

যাকোব ৪:১১-১৭ পদ

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত পদসমূহে বলা হয়েছে,

পরনিন্দাজনিত পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "হে ভাইয়েরা, পরস্পর নিন্দা কোরো না," পদ ১১। এর গ্রীক শব্দ *Katalaleite*, এই কথার অর্থ হল, যে কোন কথা যা অন্যদের মনে আঘাত দেয় এবং ক্ষতি সাধন করে। অন্যদের সম্পর্কে আমাদের কোন ধরনের নিন্দা করা উচিত নয়। যদি তা সত্য হয়েও থাকে তবুও আমাদের নিন্দা করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। এমন কি নিন্দা করার মত কোন কিছু ঘটলেও অথবা নিন্দা করার মত সুনির্দিষ্ট কোন কারণ থাকলেও নিন্দা না করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে দমন করতে হবে। যখন কোন কিছু মিথ্যা হিসাবে গণ্য হবে তখন আমাদের অবশ্যই নিন্দা করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, তাদের সম্পর্কে যেন কোন নিন্দা সূচক অভিযোগ না করি। অথবা যদি আমাদের মনে হয়েও থাকে যে, কথাগুলো সত্য তথাপি আমরা নিন্দা করব না। আমাদের কথা অবশ্যই দয়ার অনুশাসন দ্বারা এবং সত্য ও ন্যায়বিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এটিকে শলোমন তার ধার্মিক মহিলাদের চরিত্রের একটি আবশ্যক অংশ করেছিলেন, তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খুললেন, তাঁর কথায় দয়ার ব্যবস্থা থাকে, হিতোপদেশ ৩১:২৬। এটি প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীদের চরিত্রের অংশ হওয়া আবশ্যক। "পরস্পর নিন্দা করো না।"

ক. কারণ তোমরা পরস্পর ভাই। পত্রের লেখক এখানে এই বিষয়টি অতি অবশ্য করণীয় বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই, তাই পরস্পরকে কুপিত করা

এবং তাদের অপবাদ দেওয়া উচিত নয়। আমাদের ভাইদের সুনামের জন্য আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং তাদের প্রতি দয়াশীল মন থাকা আবশ্যক। যদি আমরা কোথাও কারও সম্পর্কে বা কোন বিষয়ে ভাল কথা বলতে না পারি তাহলে আমাদের উচিত ঐ বিষয়ে কিংবা তার সম্পর্কে কোন প্রকার নিন্দাজনক কথা না বলা। এটি হবে একটি ভাল বিষয় যে, প্রয়োজনে নীরব থাকা কিন্তু কোন প্রকার নিন্দাজনক কথা বলা উচিত না। অন্যদের দোষ এবং অন্যায় সম্পর্কে জানতে পারলে আমরা যেন আনন্দিত বা খুশি না হই। যা কিছু গোপনীয় তা প্রকাশ না করে তাদের কাছেই কেবল বলতে হবে। যা কিছু বলা হয় বা করা হয় আমরা যেন তা অতিরঞ্জিত না করি। আমরা কোন প্রকারে মিথ্যা গল্প সাজিয়ে প্রকাশ না করি। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও যদি কারও সম্পর্কে কোন অপবাদ দেওয়া হয় আর তা লোকদের কাছে ছড়িয়ে যায় তাহলে ঐ বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে কথা বলে তাদের আশ্বস্থ করতে হবে। মনে রেখো তোমরা পরস্পর ভাই।

২. কারণ এটি ব্যবস্থা বিচার করে। "যে ব্যক্তি ভাইয়ের নিন্দা করে কিংবা ভাইয়ের বিচার করে, সে ব্যবস্থার নিন্দা করে ও ব্যবস্থার বিচার করে।" মোশির ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, "কারও নিন্দা করে বেড়ানো চলবে না, লেবীয় ১৯:১৬। যীশু খ্রীষ্টের ব্যবস্থা হল, "তোমরা বিচার করো না তাহলে তোমাদেরও বিচার করা হবে না" মথি ৭:১। উভয় পদের সারমর্ম হলো, যেন মানুষ একে অন্যকে ভালবাসে। নিন্দাজনক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে নিন্দা করা হয় এবং যখন মানুষ প্রতিবেশীর দুর্নাম করে তখন সে খ্রীষ্টের আদেশের নিন্দা করে। তাদের নিন্দাজনক কথাবার্তা এবং অন্যদেরকে বিচার করার মধ্য দিয়ে বস্তুত ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে নিন্দা করা হয়। তাই আমাদের সচেতন হতে হবে এবং আত্মসংযমী হতে হবে যেন নিন্দাসূচক কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারি। যারা বিশ্বসী, তাদের পরস্পরের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন বিষয়ে কথা বলার জন্য যাকোব তৎপর ছিলেন। কারণ তারা তাদের মতানৈক্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এখানে পত্র লেখক বলেছেন, যে কেউ ঈশ্বরের ব্যবস্থার কোন বিষয়ের সঙ্গে একমত হতে না পারার কারণে কোন ভাইকে দোষারোপ করে কিংবা তার নিন্দা করে তাহলে সে ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারনা না থাকার কারণে বস্তুত সে ব্যবস্থাকেই নিন্দা করছে। আর এর ফলে তার মধ্যে মন্দ কাজ করার প্রবণতা দেখা যাবে। যে কেউ তার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং অন্য যে কিছুর দোহাই দিয়ে অথবা নিজে ঈশ্বরের বাক্য মান্য করার জন্য দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ নয় তাহলে এর দ্বারা সে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে এটাই প্রকাশ করতে চাইবে যে তা খাঁটি নিয়ম নয়। আসুন আমরা ব্যবস্থার বিচারের ব্যাপারে মনোযোগী হই, কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থা হল খাঁটি ও পবিত্র। যদি কেউ ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করে, তাহলে ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিচারের উপর তাকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি তারা ব্যবস্থা ভঙ্গ না করে, তাহলে আমরা যেন তাদের বিচার না করি।" এটি অত্যন্ত মন্দ। কারণ আমরা যে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করতে বাধ্য এবং এর উপর আমরা আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত করেছি তা আমাদের মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে, যেন আমরা এই ব্যবস্থার দ্বারা বিচারিত হই। যাকে পাপের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় তাকে ঈশ্বরের ব্যবস্থার পালনকারী নয় বলে তাকে সতর্ক করা হয় নি, কিন্তু তাকে বিচার সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। যা তার অংশ ভুক্ত নয় তা নিয়ে সে

গর্ব বোধ করে। আর এই জন্য অবশেষে এই গর্বের কারণে তাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে। যাদের ব্যবস্থার দ্বারা বিচারিত হবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে মূলত তারা ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. যেহেতু ঈশ্বর ব্যবস্থা প্রদানকারী; তাই মানুষকে সম্পূর্ণভাবে শাস্তি প্রদান করার সর্বময় ক্ষমতা তিনি স্বয়ং সংরক্ষণ করে রেখেছেন, "একমাত্র ব্যবস্থাদাতা এবং বিচারকর্তা আছেন। তিনিই পরিত্রাণ করতে এবং বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?" পদ ১২।

রাজা এবং রাজ্য এই দুটি বিষয় পরস্পর থেকে আলাদা নয়। এখানে যা বলা হয়েছে তা ব্যবস্থার কথা। মানুষের প্রণীত ব্যবস্থা কখনোই রাজ্যের প্রজাদের তা পালন না করার জন্য উৎসাহিত করে না। কিন্তু ঈশ্বর এখন পর্যন্ত ব্যবস্থাদাতা হিসেবে গন্য তা মানতে আমরা বাধ্য। কেবল তিনি আমাদের বিবেককে পরিশুদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তা মানতে সবাই বাধ্য। তিনি যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা একেবারে অকট্য এবং অখন্ডনীয়। কারণ এই ব্যবস্থা কার্যকারী কিংবা বলবৎ করার অধিকার এবং ক্ষমতা আছে। তাঁর যেমন রক্ষা করার ক্ষমতা আছে ঠিক তেমনি ধ্বংস করার ক্ষমতাও আছে। তেমনি ব্যবস্থা অমান্য করার কারণে শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। তিনি মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারেন অর্থাৎ মানুষকে পরিত্রাণ দান করতে পারেন এবং তাঁকে চিরকালের জন্য সুখী করতে পারেন। অথবা তিনি তাঁকে মেরে ফেলার পর দোজখে পাঠাতে পারেন। এই কারণে আমাদের এই রকম মহান ব্যবস্থাদাতাকে ভয় করা উচিত এবং তাঁকে মান্য করা উচিত এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁর উপর অর্পন করা উচিত। আমরা বুঝতে পারি যে, এই ব্যবস্থা এই পৃথিবীর কোন মানুষ কিংবা মানুষের দলের বিবেককে বেধে রাখার জন্য দেওয়া হয় নি। কারণ এটি ঈশ্বরের বিশেষ অধিকারভুক্ত, যা কখনোই লঙ্ঘন করা যাবে না। পত্র লেখক এর আগে যেভাবে অনেক নেতা হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন তেমনি এখানে অনেক বিচারক হওয়ার সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। আসুন আমরা যেন আমাদের ভাইদের কোন বিচার না করি এবং তাদের সম্পর্কে কোন নিন্দা না করি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ না করি।

আমাদের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর এই ব্যবস্থা সকলের জন্য। আর এই কারণে আমরা আর কোন ব্যবস্থাকে প্রবর্তন কিংবা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না। আমরা যেন আমাদের চারপাশের অবস্থার জন্য আমাদের নিজেদের তৈরি করা ধারনা কিংবা মতকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা না ভাবি। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, একমাত্র ব্যবস্থাদাতা আছেন, আর তিনি হলেন ঈশ্বর।

খ. আমাদের জীবনে চলমান অবস্থা সম্পর্কে অহংকারপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস এবং কোন পরিকল্পনা করার পর সেই পরিকল্পনার সফলতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে, পদ ১৩-১৪।

পত্র লেখক, ব্যবস্থার নিন্দাকারী এবং দোষারোপকারী তিরস্কার করেছেন। এখন, এখানে তিনি ঠিক একইভাবে ঈশ্বরের যত্নশীলতা এবং অনুগ্রহের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না তাদের তিরস্কার করেছেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যস্ত থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়া কথা বলার প্রবণতা তাদের ছিল। মনে হয় গ্রীক শব্দের অর্থ এই রকম যে, "এখন দেখ, অথবা "দেখ এবং বিবেচনা কর, তুমি এই কথা বলেছ, আজ কিংবা আগামীকাল, আমরা অমুক নগরে যাব এবং সেখানে এক বছর যাপন করবো, বাণিজ্য করে লাভ করবো। কথা এবং চিন্তার এই প্রবণতার প্রতিফল সামান্য যার হিসাব করতে আমরা ব্যস্ত থাকব।" আমরা যে সব কথা বলি এবং যে উপায়ে কাজ করি তাতে মারাত্মক প্রতিফলন ঘটে যা অত্যন্ত মন্দ, আর এই নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি। আমাদের অমনোযোগিতার ফলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এটি চলমান থাকে। কেউ কেউ ছিলেন যারা সেকেলে কথাবার্তা বলতেন, এভাবে এখনও একইভাবে অনেকে কথা বলেছেন, আমরা অমুক শহরে যাব এবং সেখানে গিয়ে আমরা এটা করব ওটা করব এবং সেখানে অমুক সময় পর্যন্ত থাকব। এই রকম সীমাবদ্ধ সময়ের কথা তারা বলে থাকেন এবং তারা এত ব্যস্ত থাকে যে, এই সব বিষয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিষয়টি তারা অবহেলা করে। এখানে লক্ষ্য করুন,

কিভাবে মানুষ তাদের মতলবকে বাস্তবায়িত করার জন্য দুনিয়াবীভাবে ব্যস্ত হয় এবং তাদের মতলবকে প্রাধান্য দেবার কারণে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করছে। যেখানে কেউ পার্থিব বিষয় গচ্ছিত রাখে সেই বিষয়ের জন্য তার অদ্ভুদ ধরনের চিন্তা কাজ করতে পারে আর সে ঐ বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকবে। সুতরাং জগতে আমরা সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, আমাদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যেসব পদক্ষেপ আমরা নেই এবং যে কাজগুলো করতে আমরা আগ্রহী হই তা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা কোন ভুল না করি।

পার্থিব ভাবে সুখী হওয়ার জন্য মানুষ আগে থেকে নিজেরা অনেক বেশি আশার কথা কল্পনা করে থাকে। তারা ভবিষ্যতে যা কিছু করবে তা নিয়ে তাদের মাথা নানা রকম স্বপ্ন দিয়ে পূর্ণ করে রাখে। এই জন্য আসুন লক্ষ্য করি,

ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা না থাকে আর কেউ যদি মনে করে ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে সব কিছুই ভাল এবং মঙ্গলজনক হবে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত চিন্তা হবে এবং তার আশা নিষ্ফল হবে (তারা বলছে) 'আমরা অমুক শহরে যাব'। যেমন আন্তিয়খিয়া বা দামেস্ক অথবা আলেকজান্দ্রিয়া, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চমৎকার সুযোগ রয়েছে। এই শহরে ব্যবসা করলে অনেক লাভ করা যাবে। কিন্তু তারা কিভাবে নিশ্চিত হয় যে, সেই শহরে তারা গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করলে তাদের আশা পূরণ হবে এবং তারা অনেক লাভবান হবে? কোন কিছু তাদের আশা পূরণ হওয়ার সমস্ত উপায় এবং পথ বন্ধ করে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে বা তারা অন্য কোথাও যেতে বাধ্য হতে পারে, অথবা তাদের জীবনের সূতা কেটে যেতে পারে। অনেকে আছেন যারা তাদের দীর্ঘ লক্ষ্যস্থলের দিকে আড়ম্বরের সঙ্গে যাত্রা শুরু করে কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে যারা তাদের লক্ষ্যস্থলের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছাতে পারেন না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তারা তাদের আশা এবং লক্ষ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট শহরে

গিয়ে পৌঁছালো কিন্তু তারা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে যে, তারা সেখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে যেতে পারবে? সেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে যার কারণে তারা আবার ফিরে আসতে বাধ্য হবে অথবা সেই শহর থেকে তাদের অন্য কোথাও ডাকা হতে পারে, আর এই জন্য সেখানে তাদের অবস্থান হবে খুব অল্প সময়ের জন্য। অথবা যদি এমন হয় যে, তারা যেভাবে আশা করেছিল সেভাবে তারা ঐ শহরে পূর্ণ সময় অবস্থান করল। তথাপি তারা নিশ্চিত হতে পারবে না যে, সেখানে তারা ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে, এমন হতে পারে তারা সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়বে। এমনও হতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য তারা যা কিছু প্রত্যাশা করেছে তা তারা পায় নি। হ্যাঁ যদি এমন হয়, তারা তাদের প্রত্যাশিত শহরে গেল। সেখানে তারা পুরো এক বছর অবস্থান করলো এবং তারা সেখানে ক্রয় বিক্রয় করল, তথাপি তারা সেখানে লাভবান নাও হতে পারে। যা কিছু অ-নশ্চিত, এই পৃথিবীতে সেই সব বিষয়ে হয়ত কিছুটা লাভ অর্জন করতে পারে। কিন্তু সম্ভবত তারা একটি মাত্র বিষয় লাভবান হলেও তারা অন্য দিকে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। আর তাই জীবনের এই সব দুর্বলতা, অসমাপ্ত অবস্থা এবং অ-নশ্চয়তা নেমে আসে। এই জন্য ভবিষ্যতের বিষয়ে এভাবে পরিকল্পনা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার দাম্ভিক মনোভাব এবং অহংকারকে আমাদের অবশ্যই দমন করতে হবে: "তোমাদের জীবন কি রকম? তোমরা তো বাষ্পস্বরূপ, যা কিছুক্ষণের জন্য থেকে পরে অন্তর্নির্হিত হয়, পদ ১৪।" আমাদের জীবনে ভবিষ্যতে যা ঘটবে এর জন্য অন্ধকারময় অবস্থা সম্পর্কে এবং আমাদের জীবনের স্থিতিকাল সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামীকাল কিংবা তার পরের দিন কি ঘটবে তা আমরা জানি না। আমরা কি করব, আমরা শুধু আমাদের এই পরিকল্পনার কথাই জানতে পারি এবং মনে করতে পারি যে, এটা সফল হবে। কিন্তু হাজার হাজার ঘটনা ঘটতে পারে যা সব কিছুই বাধা দিয়ে থামিয়ে দিতে পারে। আমরা আমাদের জীবনের কোন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত নই। কারণ এটি কেবল বাষ্পস্বরূপ, যদিও কিছুটা প্রকাশিত হয় তথাপি এটি কঠিন কিংবা নিশ্চিত কোন বিষয় নয়, এটি খুব তাড়াতাড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চলে যায়। আমরা আগামীকালের সূর্যের উদয় এবং অস্ত গমনের ঘন্টা এবং মিনিট নির্ধারণ করতে পারি। কিন্তু বাষ্পের ছড়িয়ে পড়ার নির্দিষ্ট সময় আমরা বেধে দিতে পারি না। আমাদের জীবনও ঠিক তেমনি। আমাদের জীবন কেবল কিছু সময়ের জন্য আর্বির্ভূত হয়, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। এই পৃথিবীতে যেমন করে তা অদৃশ্য হয়ে যায় তেমনি আর একটি পৃথিবী আছে যে পৃথিবীতে জীবন চিরকাল বেঁচে থাকে। আর এই জীবন অনিশ্চয়তার জীবন নয়। এই জীবনের জন্য আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে এবং আমাদের সেই জীবনের জন্য তা সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

গ. ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আমাদের জীবন যাপনের মনোভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার বিষয়ে আমরা শিখব। এভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ এবং তা উপভোগ করার বিষয়েও আমরা শিখব: "তোমাদের এই কথা বলা উচিত, প্রভুর ইচ্ছা হলেই আমরা বেঁচে থাকব এবং এই কাজটি বা ঐ কাজটি করব," পদ ১৫।

পত্র লেখক যারা মন্দ ভাবে পরিকল্পনা করে তাদের তিরস্কার করেছেন। এখন তিনি তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের কি করা ভাল এবং তারা কিভাবে তা করবে: সব সময় অন্তরে যেন এই কথা উচ্চারিত হয়। আর তোমার মুখ যেন উপযুক্ত উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ্যে তা বলে, এবং তা তোমার নিয়মিত প্রার্থনা এবং এবাদতে তা বলবে। যদি ঈশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তোমাকে স্বীকার করেন এবং আর্শীবাদ করেন তাহলে তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তুমি কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।" এটি নিশ্চয়ই বলতে হবে, তবে তা যেন অতি সামান্য না হয় এবং স্বাভাবিক এবং নিয়ম মাফিক না হয়। কিন্তু আমরা বলি তা নিয়ে যেন আমরা চিন্তা করি এবং আমরা যা বলি তা যেন ভক্তিপূর্ণ এবং আন্তরিক হয়। যখন আমরা অন্যদের সঙ্গে কথা বলি তখন আমরা যদি এই বিষয়টি প্রকাশ করতে পারি তাহলে তা উত্তম বিষয় হবে। এই বিষয়টি অপরিহার্যরূপে আবশ্যক যেন আমরা সকল কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় এই কথা বলি। ঈশ্বরের আশ্রয় এবং অনুগ্রহ দ্বারা প্রত্যেক কাজের শুরুতে গ্রীক ভাষায় এটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. "প্রভুর ইচ্ছা হলেই আমরা বেঁচে থাকব।" আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সময় আমাদের হাতে নেই। এটি সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অধিকার। আমরা কত দিন বেঁচে থাকব তা ঈশ্বর নিরুপন করে রেখেছেন এবং আমাদের জীবনের আস্থা তাঁর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে আছে। এই জন্য তাঁর কাছে আমাদের নম্র হতে হবে, কারণ আমাদের জীবন তাঁর হাতে। আর তাই,

খ. " প্রভুর ইচ্ছা হলেই আমরা এই কাজটি করব।" আমাদের সমস্ত কাজ এবং পরিকল্পনা স্বর্গের নিয়ন্ত্রণের অধীনে। আমাদের মাথা হয়ত অনেক রকম চিন্তা করে এবং পরি-কল্পনা পূর্ণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমরা হয়ত আমাদের জন্য এবং আমাদের পরিবারের জন্য কিংবা আমাদের বন্ধুদের জন্য এই বিষয়টি বা অন্য বিষয়ের জন্য প্রস্তাব করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর কখনো কখনো আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সব উপায় ভেঙ্গে দেন এবং আমাদের সব পরিকল্পনা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এই জন্য আমাদের সব কাজের পরামর্শ এবং আমাদের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সব ভার সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর অর্পন করা উচিত। আমরা যা কিছু পরিকল্পনা করি কিংবা যা কিছু করি নম্রভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে তা করতে হবে।

ঘ. আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা মিথ্যা অহংকার করা থেকে নিজেদের দূরে রাখি। আমরা এটি যেন দুর্বল বিষয় বলে মনে না করি, কিন্তু মনে রাখতে এটি অত্যন্ত মন্দ বিষয়। "কিন্ত তোমরা নিজ নিজ অহংকারে গর্ব করছ, কিন্তু এই রকম সমস্ত গর্ব মন্দ" পদ ১৬। ঈশ্বরতে তারা সত্যিকারভাবে কোন প্রকার সম্মান না দেখিয়ে তারা এই পৃথিবীর বড় বড় বিষয় এবং তাদের জীবন আর সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করে। আর এই জন্য পরে এই সব বিষয়ের জন্য তাদের মনে অহংকারের জন্ম নেয়। পৃথিবীর মানুষ তাদের সমস্ত সফলতার জন্য অহংকারী হয়ে উঠে আর এভাবেই তারা আনন্দ উপভোগ করে। তাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনার সফলতার বিষয়ে জানার আগে তারা প্রায়ই অহংকারী মনোভাব দেখায়। মানুষের নিজের অহংকার এবং অসার কাজ থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয় এবং যা কিছু উঠে

আসে তা নিয়ে মানুষের পক্ষে গর্ব করা কত না সহজ! এই রকম আনন্দ আর সুখ হল (লেখক বলেছেন) মন্দ। এই রকম আনন্দ করা হল বোকামী এবং ক্ষতিকর। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমপর্ণের জন্য নম্র হয়ে উপস্থিত না হয়ে যখন মানুষ তার উচ্চ আকাঙ্খার পরিকল্পনা এবং পার্থিব বিষয়ের জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তা হয় সম্পূর্ণ মন্দ বিষয় (পদ ৮-১০)। ঈশ্বরের বিবেচনায় এটি মহাপাপ, এটি তারা তাদের উপর নৈরাজ্যজনক ভাবে তাদের অবস্থাকে ডেকে আনবে এবং এটি প্রমাণ করবে যে, অবশেষে তারা ধ্বংস হবে। আমাদের সব কিছু তাঁর হাতে রয়েছে বলে, তাঁর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের জীবনের ঘটনাগুলো এবং তিনিই আমাদের একমাত্র ঈশ্বর, যদি এই সব কথা ভেবে আমরা আনন্দ করি তবে এই আনন্দ হবে প্রকৃত আনন্দ, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় আনন্দ। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং তাঁর দয়াশীলতা আমাদের সমস্ত বিষয়ের মঙ্গলের জন্য একসাথে কাজ করে। কিন্তু আমরা আমাদের নিষ্ফল এবং দাম্ভিক বিশ্বাস এবং অহংকারপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে আনন্দ করি তা হবে সমস্ত মন্দ বিষয়। যারা উত্তম এবং প্রজ্ঞাবান মানুষ তারা নিশ্চয় এই সব বিষয় সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলবে।

ঙ) আমরা এখানে শিখব, আমরা যা কিছু করছি সেই সব কিছুতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং আদৌ আমরা এই সব কাজ ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে করছি নাকি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে করছি, আমরা দেখবো যে, আমরা যেন কখনোই আমাদের নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে বিপরীত কোন কাজ না করি, (পদ ১৭): "বস্তুত যে কেউ সৎকর্ম করতে জানে, অথচ না করে সে পাপ করে।" এটি অধিকতর পাপ, এটি সকলের সঙ্গে পাপ করে। এটি তার বিবেকের বিরুদ্ধে মন্দ সাক্ষ্য দেয়। লক্ষ্য করুন,

১) উক্তিটির সরল উপদেশের সঙ্গে এটি যুক্ত হয়ে আছে। "প্রভুর ইচ্ছা হলেই আমরা এই কাজটি করব বা ও কাজটি করব।" এটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয়, আমরা আমাদের জীবনের মঙ্গলের জন্য সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের উপরে আমাদের সমস্ত ভার অর্পন করেছি এবং একই সঙ্গে আমরা আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং আমাদের সমস্ত কিছুর ভারও অর্পন করেছি, এ কথা কে না জানে?" এখন মনে রাখতে হবে, যদি তুমি এ কথা জেনে থাক, তাহলে যখনই তোমার এই নির্ভরশীলতার কোন কাজ করতে হয়, তবে তা করো। কারণ মনে রেখো, "বস্তুত যে কেউ সৎকর্ম করতে জানে, অথচ না করে সে পাপ করে।" এটি গুরুতর পাপ।

২) কাজ কর্মে অবহেলা হল পাপ, যা আমাদের বিচারক, বিচারের সময় উপস্থাপন করবেন। তিনি দোষী সাব্যস্ত করবেন। তাই আসুন আমরা সতর্ক হই যেন আমাদের বিবেক যথাযথভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং আমাদের বিবেক যেন বিশ্বস্ত থাকে এবং সব সময় বিশ্বস্ত থাকে। কারণ, "যদি আমাদের অন্তর আমাদের দোষী না করে তা হলে ঈশ্বরের কাছে আমরা নির্দোষ থাকব।" কিন্তু যদি বলি, "আমরা দেখছি এবং আমাদের দৃষ্টিতে উপযুক্ত কাজ করছি না, তাহলে আমাদের মধ্যে পাপ আছে।" যোহন ৯:৪১।

যাকোবের লেখা পত্র

অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে প্রেরিত যাকোব সেই সমস্ত লোকদের উপরে ঈশ্বরের বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন, যারা ধনী হয়েও দরিদ্রদের উপরে শোষণ চালায়। তিনি দেখিয়েছেন যে, তাদের পাপ ও মূর্খতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কতটা বড় এবং তারা নিজেদের উপরে কত মারাত্মক শাস্তি ডেকে নিয়ে আসছে, পদ ১-৬। এরপর সকল বিশ্বাসী মানুষকে তাদের কষ্ট ও দুঃখভোগের মাঝে ধৈর্য ধারণ করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে, পদ ৭-১১। প্রতিজ্ঞা করার পাপের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, পদ ১২। দুঃখভোগ ও প্রফুল্লতা উভয় অবস্থার মধ্যে কীভাবে আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পদ ১৩। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ও তেল দ্বারা অভিষেক করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, পদ ১৪,১৫। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে পরস্পরের কাছে ভুলগুলো স্বীকার করতে ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং প্রার্থনার কার্যকারিতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, পদ ১৬-১৮। সবশেষে, যারা সত্যের পথ থেকে দূরে সরে গেছে তাদেরকে আমরা আবার কীভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি সে বিষয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যাকোব ৫:১-১১ পদ

এখানে প্রেরিত যাকোব প্রথমে পাপীদের প্রতি কথা বলার পর ঈশ্বরভক্ত ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি কথা বলছেন।

ক. আসুন আমরা পাপীদের প্রতি যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে তা দেখি। এখানে আমরা দেখবো যাকোব ঠিক যেন তাঁর মহান প্রভু খ্রীষ্টের মত করেই বলছেন: *ধিক্ তোমাদেরকে, তোমরা যারা ধনবান, কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পেয়েছ*, লূক ৬:২৪। যে সমস্ত ধনী ব্যক্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল না, বরং তারা ছিল পৌত্তলিক ও অবিশ্বসী যিহূদী। এরা ধার্মিককে দোষী করেছে এবং খুন করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে কিছু করার মত ক্ষমতা বিশ্বাসীদের ছিল না। যদিও এই পত্রটি

লেখা হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য এবং তা মূলত তাদের কাছেই প্রেরণ করা হয়েছিল, তথাপি বিশ্বাসীদের মধ্য দিয়ে অবিশ্বসী যিহূদীদের মাঝে কিছুটা হলেও যেন চেতনা জাগ্রত করা যায় তার জন্য তিনি তাদের প্রতি এই বক্তব্য এখানে রেখেছেন। তারা কখনোই এ ধরনের কথা শুনতে চাইবে না। এ কারণে তিনি লিখিতভাবে বিশ্বাসীদের কাছে এই বক্তব্য প্রেরণ করেছেন, যেন পরবর্তীতে যে কোন সময়ে তা পাঠ করা যায়। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পৌলের মত করে যাকোব তাঁর পত্রের শুরুতে এ কথা বলেন নি যে, *খ্রীষ্টতে আমার ভাইদের প্রতি*; বরং তিনি আরও সার্বজনীন ভঙ্গিতে বলেছেন *বারো বংশের সমীপে*। সেই সাথে তিনি সম্ভাষণ হিসেবে *খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও শান্তি* বলেন নি, বরং শুধু *শুভেচ্ছা বা মঙ্গলবাদ জানিয়েছেন*, যাকোব ১:১। যিহূদীদের মধ্যকার দরিদ্ররা সুসমাচার গ্রহণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা তাদের বিশ্বাসহীনতায় আরও দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। যারা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে এই ধনী ব্যক্তিরা ঘৃণা করত এবং নির্যাতন করত। এই সকল নির্যাতনকারী, অবিশ্বসী, শোষক, ধনী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে প্রেরিত যাকোব তাঁর পত্রের এই অধ্যায়টির প্রথম ছয় পদ লিখেছেন।

১. তাদের উপরে ঈশ্বরের যে বিচার নেমে আসতে চলেছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্বাভাস দিয়েছেন, পদ ১-৩। তাদের উপরে অচিরেই নেমে আসবে চরম দুর্দশা। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এমন হবে যে, এর বর্ণনা শুনেই তারা কান্নাকাটি ও হাহাকার জুড়ে দেবে। যে সমস্ত জিনিস নিয়ে তারা সবচেয়ে বেশি খুশি থাকে সেই সমস্ত জিনিসকে ঘিরেই তাদের দুঃখ ও দুর্দশার শুরু হবে। আর তাদের এই প্রিয় সব জিনিসই শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। সে কারণে এখন তাদেরকে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে দেখার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেন ঈশ্বরের সামনে বিচারে দাঁড়ানোর আগে তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নেয়।

(১) এই সমস্ত ধনী লোকদের এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, খুব শীঘ্রই তাদের উপরে মহা দুঃখ দুর্দশা নেমে আসছে। সেই দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে তাদের না থাকবে কোন সহায়, না থাকবে কোন সান্ত্বনা। তাদের থাকবে শুধু দুঃখ আর কষ্ট। তারা যে পৃথিবীতে এতদিন সুখের সময় কাটিয়েছে, সেই পৃথিবীতেই তাদের জন্য নেমে আসবে নরকের যন্ত্রণা। তাদের অন্তরের সমস্ত লোভ ও অভিলাষ ফিরে তাদেরকেই আক্রমণ করবে। শুধুমাত্র একটি দুটি বিষয়ে তারা যে দুর্দশাগ্রস্ত হবে তা নয়, বরং তাদের বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের প্রত্যেকটি বস্তু তাদের জন্য দুর্দশার কারণ হয়ে উঠবে। তাদের মণ্ডলী ও জাতির ধ্বংস অতি আসন্ন। সেদিন আর তাদের কোন ধন সম্পদই তাদের দুর্দশা দূর করতে পারবে না। তাদের সমস্ত মন্দতা ও কলুষতা সেদিন বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

(২) ধনীদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এমন হবে যে, এর প্রারম্ভিক অবস্থা দেখেই তারা কান্নাকাটি ও হাহাকার জুড়ে দেবে। ধনী লোকেরা নিজেদেরকে বলতে পছন্দ করে, *খাওয়া-দাওয়া কর, পান কর ও আনন্দে থাক*। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে বলেন, *কান্নাকাটি ও হাহাকার কর*। এ কথা বলা হয় নি যে, কাঁদো ও অনুশোচনা কর, কারণ প্রেরিত যাকোব তাদের কাছ

থেকে এমনটা আশা করেন নি। তিনি তাদের সংশোধনের চেষ্টা না করে অনেকটা তাদেরকে অভিযুক্তই করেছেন এবং বলেছেন, "তোমাদের উপরে যেসব দুর্দশা আসছে, সেই সবের জন্য কান্নাকাটি ও হাহাকার কর। কারণ তোমাদের উপরে যখন সেই মহা দুর্যোগ নেমে আসবে তখন দন্ত ঘর্ষণ ও কান্নাকাটি ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।" যারা পশুদের মত করে জীবন ধারণ করে তাদেরকে এভাবেই আর্তনাদ ও হাহাকার করতে বলা উচিত। যখন কোন জাতির জীবনে দুর্দশা নেমে আসে তখন তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনী তারাই এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা এতদিন ধরে যে সুখ, সম্পদের প্রাচুর্য ও নিরাপত্তার মাঝে বসবাস করে আসছিল, সেই সাম্রাজ্য এখন ধ্বংস হতে বসেছে। সে কারণেই অন্যদের চেয়ে তাদের কান্নাকাটি ও হাহাকার আরও বেশি করে শোনা যাবে।

(৩) তারা যে সমস্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয় সেই সমস্ত বিষয়েই তারা সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হবে। "তোমাদের সমস্ত পছন্দনীয় বস্তুর উপরে নেমে আসবে ধ্বংস, ক্ষয়, মরিচা ও বিনাশ: *তোমাদের ধন নষ্ট হয়ে গেছে ও তোমাদের কাপড়গুলো পোকায় কেটেছে; তোমাদের সোনা ও রূপায় মরিচা ধরেছে*, পদ ২। তোমরা এখন যে সমস্ত বস্তু এত যত্ন করে সংরক্ষণ করছো, সেগুলো আর তোমাদের কোন কাজেই আসবে না। বরং সেগুলোর কারণে তোমরা মহা দুঃখ ও কষ্টে জর্জরিত হবে।

(৪) "আর সেই মরিচাই তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং আগুনের মত তোমাদের মাংস খাবে," পদ ৩। পবিত্র শাস্ত্রে প্রায়শই মন্দ লোকদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হিসেবে জড় বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই মন্দ লোকদের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠবে। তারা ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার চিন্তা করবে, যেন পরবর্তী সময়ে তারা মহা আরামে জীবন ধারণ করতে পারে এবং প্রাচুর্যের মাঝে বসবাস করতে পারে। কিন্তু হায়! তারা এই সমস্ত সম্পদ সঞ্চয় করে রাখছে শুধুমাত্র অন্যদের ভোগের সামগ্রী করে তোলার জন্য (যেমন রোমীয়রা যিহূদীদের কাছ থেকে তাদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল)। এই সমস্ত সম্পদই সেই দিনে তাদের ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যেদিন ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচার প্রকাশিত হবে। তখন তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের সমস্ত অধার্মিকতা আগুনের মত তাদের মাংস খাবে। যিরূশালেমের ধ্বংসস্তূপে হাজার হাজার মানুষ পুড়ে মারা গিয়েছিল। শেষ বিচারের দিনে মন্দরা অনন্তকালীন আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করবে, যা শয়তান ও তার পতিত স্বর্গদূতদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই দিনে প্রভু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের লোকদেরকে, পবিত্র লোকদেরকে সেই আগুনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আমরাও যেন তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে থাকতে পারি সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

২. প্রেরিত যাকোব দেখিয়েছেন যে, কী কী পাপ আমাদের জীবনে এ ধরনের দুর্দশা ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এ ধরনের মহা দুর্দশায় পতিত হওয়ার কারণ অবশ্যই গুরুতর ও মারাত্মক কোন পাপ।

(১) এ ধরনের মানুষকে কপটতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তারা দরিদ্রদেকে শোষণ করে নিজেরা যে সম্পদের পাহাড় গড়েছে, যত স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করেছে তার সবই পোকায় খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। ঈশ্বর আমাদেরকে পার্থিব ধন সম্পদ দান করেন যেন আমরা এই সম্পদের মধ্য দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরব করি এবং মানুষের জন্য মঙ্গল সাধন করি। কিন্তু এর পরিবর্তে এই সকল মন্দ মানুষেরা তার অপব্যবহার করে থাকে। তারা দরিদ্র ও অভাবী মানুষদেরকে ঈশ্বরের সৃষ্টির অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অমান্য করে। এটি অত্যন্ত মারাত্মক ও ক্ষমার অযোগ্য পাপ। তাদের বিরুদ্ধে এই পাপ তাদের সম্পদের মতই পাহাড় সমান উঁচু হয়ে উঠেছে।

(২) যাকোব এখানে আরেকটি পাপের দায়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন, আর তা হচ্ছে নির্যাতন ও শোষণ: *দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেতের শস্য কেটেছে, তোমরা তাদের যে মজুরি থেকে বঞ্চিত করেছ*, পদ ৪। যাদের হাতে অধিক সম্পদ থাকে তাদের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাকে মানুষ প্রায়শই তাদের নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অপব্যবহার করে এবং তারা তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে নানাভাবে শোষণ করে থাকে। এখানে যে ধনী লোকদের কথা বলা হচ্ছে তারা দরিদ্রদেরকে তাদের অধীনে নিয়োগ দান করে। দরিদ্রদের যেমন ধনীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয়কৃত অর্থ প্রয়োজন, তেমনি ধনীদেরও প্রয়োজন দরিদ্রদের প্রদত্ত শ্রম। কিন্তু ধনীরা বরাবরই এ বিষয়টি বিবেচনা না করে দরিদ্র শ্রমজীবিদের প্রাপ্য অধিকার ও প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। তাদের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকায় তারা বাহুবলে দরিদ্রদেরকে দমিয়ে রাখে এবং তাদের ইচ্ছামত অল্প মজুরি দিয়ে থাকে। দরিদ্ররা তাদের কথা বলার কোন সুযোগ পায় না এবং উপায়ন্তর না দেখে তারা স্বল্প মজুরির বিনিময়ে শ্রম দিয়ে যায়। তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই পাপের শিকার হয়ে দরিদ্ররা যখন আর্তনাদ ও কান্নাকাটি করে, তখন সেই কান্নার শব্দ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। তখন ঈশ্বর হয়ে ওঠেন *বাহিনীগণের প্রভু*, *Kyriou sabaoth*। পুরাতন নিয়মের যে সকল স্থানে ঈশ্বরের লোকেরা নিপীড়িত, বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে, তাদের শত্রুরা যখন সংখ্যায় ছিল অগণিত, সে সকল স্থানে ঈশ্বর নিজেকে এই রূপে প্রকাশ করেছেন। বাহিনীগণের প্রভুর অধীনে এই পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু ও প্রাণী বিরাজমান। তিনি তাদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য। তাঁর অধীনে এক বাহিনী রয়েছে যাদেরকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই বাহিনীর মধ্যে রয়েছে স্বর্গদূতগণ, ভাববাদীগণ, পুরোহিতগণ, প্রকৃতিগত বিভিন্ন উপাদান যেমন – ঝড়, আগুন, বাতাস, ইত্যাদি। এই বাহিনী ঈশ্বরের নির্দেশে ও কর্তৃত্বে অধার্মিকতা, বর্বরতা ও মন্দতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। কাজেই শোষণকারী ও বঞ্চণাকারীদের বিরুদ্ধে বাহিনীগণের প্রভু তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াবেন এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

(৩) এখানে পরবর্তী যে পাপটির কথা বলা হয়েছে তা হল সুখভোগ ও ভোগ-বিলাস। *তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ ও ভোগ-বিলাস করেছ, তোমরা নিহত হবার দিনের জন্য নিজেদের কেবল তাজাই করেছ*, পদ ৫। ঈশ্বর আমাদেরকে সুখভোগ করতে নিষেধ করেন

নি। কিন্তু আমরা যদি জীবনে কেবল সুখভোগই করি এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ও মানুষের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ না করি তাহলে তা আমাদের জীবনে ভয়াবহ পাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র ভ্রমণকারী ও পরিব্রাজক। এই পৃথিবীতে আমাদের কিছু মাত্র সময় অবস্থান করার কথা এবং এখানে থেকে আমাদের অনন্তকালীন জীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা। কাজেই এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুখভোগ ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়া আমাদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক এক পাপ। ভোগ -বিলাসিতা মানুষকে নির্দয় করে তোলে। এ প্রসঙ্গে হোশেয় ১৩:৬ পদ আমরা দেখতে পাই: *চরাণির স্থান পেয়ে তারা তৃপ্ত হল, তৃপ্ত হয়ে অহংকারী হল, এজন্য তারা আমাকে ভুলে গেছে*। ভোগবিলাসিতা ও সুখভোগ হচ্ছে ধন সম্পদের প্রাচুর্যের এক স্বাভাবিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েও মানুষের পক্ষে নিজেকে সুখভোগের বিলীন করে দেওয়াটা খুবই কঠিন। মানুষ যখন সম্পদের প্রাচুর্য লাভ করে তখন সে নিজেকে পার্থিব ইন্দ্রিয় পরায়ণ সুখ ও অভিলাষে ডুবিয়ে দেয়। "*তোমরা নিহত হবার দিনের জন্য নিজেদের কেবল তাজাই করেছ*। তোমরা এএভাবে জীবন কাটিয়েছ যেন প্রত্যেকটি দিনই ছিল একেকটি উৎসব। সে কারণে তোমাদের অন্তর মূর্খতা, ঔদ্ধত্য, গর্ব, অলসতা ও অতৃপ্ত চাহিদায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।" অনেকে হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, "মানুষ যদি ভাল মন নিয়ে আনন্দ করে এবং তার যে সম্পদ রয়েছে তার অতিরিক্ত যদি ব্যয় না করে, তাহলে তাতে ক্ষতি কী?" তাতে কি কোন ক্ষতি নেই? মানুষ যদি তাদের সম্পদকে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার না করে নিজেদের পেট পূজা করতে শুরু করে তাহলে কি কোন ক্ষতি হয় না? মানুষ যদি তাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধন না করে কেবল তাদের দেহের আরাম আয়েশের দিকে ব্যস্ত থাকে, তাহলে কি ক্ষতি হয় না? নিঃসন্দেহে এ ধরনের জীবন যারা যাপন করে তাদের জীবনে শেষ পর্যন্ত সদোম ও ঘমোরার পরিণতিই ঘটে। এ কারণে সুখভোগ ও বিলাসিতায় জীবন ধারণ করার অর্থ গর্ব, অলসতা ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় পরিপূর্ণ জীবন কাটানো, যা মানুষের আত্মা ও অন্তরকে শেষ বিচারের দিনে অভিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

(৪) ধনীদের উপরে আনীত আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার: *তোমরা ধার্মিককে দোষী করেছ এবং খুন করেছ; সে তোমাদের প্রতিরোধ করে নি*, পদ ৬। এই অপরাধের ফলে তাদের পাপ সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। তারা যখন তীব্র সুখভোগ, বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়ের অভিলাষে মেতে ছিল, তখনও তাদের মধ্যে পরিবর্তনের কিছুটা আশা ছিল। কিন্তু যখন তারা তাদের সম্পদের মোহ ও লোভের কারণে তাদের সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেললো এবং ধার্মিকদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করেও তাদের অন্তরে এতটুকু অনুশোচনা জাগল না, তখন তারা তাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হল। তারা যে আইন বা বিধানই অনুসরণ করুক না কেন, শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বর তাঁর নিজ ব্যবস্থা অনুসারে তাদের বিচার করবেন এবং তাদের হাতে যত মানুষের রক্তের দাগ থাকবে তাদের প্রত্যেকের হত্যার শোধ তিনি নেবেন। এখানে দেখুন, ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে এই পৃথিবীতে অত্যাচার করা হচ্ছে এবং অনেককে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু যখনই একজন ধার্মিক ব্যক্তি কষ্টভোগ করে এবং তার উপরে নির্যাতন চালানো হয়, তখন ঈশ্বর সেই ধার্মিক ব্যক্তি ও

তার উপরে নির্যাতনকারীকে চিহ্নিত করে রাখেন। যখন শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হবে, সে সময় ঈশ্বর নির্যাতিতকে সম্মানিত করবেন এবং নির্যাতনকারীকে শাস্তি দেবেন। এর থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি যে, এমন এক দিন আসছে যখন নির্যাতিত মানুষের ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং নির্যাতানকারীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হবে। পাপীদের পরিণতি এমনই ভয়ঙ্কর হবে।

খ. এই অংশে আমরা দেখি প্রেরিত যাকোব ঈশ্বরভক্ত পবিত্র ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বক্তব্য রেখেছেন। পরিচর্যাকারীরা যখন পাপীদের সম্বোধন করে কথা বলার পর পবিত্র ব্যক্তিদের সম্বোধন করে কথা বলেন, অনেকেই এই ভঙ্গিটি পছন্দ করেন না। কিন্তু আমার মতে মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে দেখানো এটিই সবচেয়ে ভাল পন্থা। অসৎ মানুষ ও ভোগবিলাসী ধনী ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তার পরপরই ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের প্রতি এ ধরনের সান্ত্বনাসূচক বাণী রাখা অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে। এখানে আমরা দেখি:-

১. দায়িত্ব পালন করা: *অতএব হে ভাইয়েরা, তোমরা প্রভুর আগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধর* (পদ ৭), *নিজ নিজ হৃদয় সুস্থির কর* (পদ ৮), এবং *তোমরা এক জন অন্য জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলো না*, পদ ৯। এই তিন ধরনের প্রকাশভঙ্গি যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই:-

(১) "ধৈর্য ধর – কোন প্রকার বিরক্তির উদ্রেক না ঘটিয়ে সমস্ত পীড়ন সহ্য করে যাও, তোমাদের সমস্ত ক্ষত ও আঘাতের শোধ নেওয়া হবে। যদিও ঈশ্বর এখন তোমাদের কষ্ট ও দুঃখের কোন প্রতিকার করছেন না, কিন্তু তিনি সবই দেখছেন এবং নিরূপিত সময়ে তিনি তোমাদেরকে এর জবাব দেবেন। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তিনি তাঁর উপযুক্ত সময়ে আমাদেরকে দেখা দেবেন। আমাদের এখন একটু অপেক্ষা করতে হবে ঠিকই, কিন্তু তিনি অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ধার্মিক লোকদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এ কারণে এখন এই সকল পার্থিব দুঃখ ও কষ্ট আমাদের ধৈর্যপূর্বক সহ্য করতে হবে।" এখানে ধৈর্য ধরার পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে *makrothymesate*। আমরা যখন আমাদের দায়িত্ব পালন শেষ করব, সে সময় পুরস্কার লাভ করার আগ পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই খ্রীষ্টিয় ধৈর্য কোন সাধারণ বিষয় নয়। এই ধৈর্য ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হয় স্বর্গীয় জ্ঞান ও ঈশ্বরের অনুমোদন, সেই সাথে ভবিষ্যতের গৌরবময় পুরস্কারের প্রত্যাশা: *প্রভুর আগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধর*। যেহেতু এই শিক্ষাটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবনে অবশ্য পালনীয়, সেজন্য ৮ পদে আবারও তা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে: *তোমরাও ধৈর্য ধর*।

(২) "*নিজ নিজ হৃদয় সুস্থির কর* – তোমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হোক, তাতে কোন বিহ্বলতা বা শিথিলতা না থাকুক। যত নির্যাতন ও পীড়ন আসুক না কেন, তোমাদের মধ্যে যে উত্তমতা রয়েছে তা যেন সব সময় এমনই অকৃত্রিম ও পরিপূর্ণ থাকে।" মন্দদের সমৃদ্ধি অর্জন এবং উত্তমদের পীড়ন সকল যুগেই ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাসের এক মহা পরীক্ষা হিসেবে দেখা

দিয়ে এসেছে। রাজা দায়ূদ আমাদেরকে বলছেন যে, আমার চরণ প্রায় টলেছিল; আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হয়েছিল। কারণ যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখেছিলাম, তখন গর্বিতদের প্রতি ঈর্ষা করেছিলাম, গীতসংহিতা ৭৩:২,৩। যে সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে প্রেরিত যাকোব এই পত্রটি লিখেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভবত এ ধরনের পরিস্থিতিতেই পড়েছিলেন। সে কারণে তাদেরকে যাকোব অন্তরে বিশ্বাস ও ধৈর্য ধারণ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

(৩) *হে ভাইয়েরা, তোমরা এক জন অন্য জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলো না*। এখানে বলা হয়েছে *সব* ***stenazete***, যার অর্থ পরস্পরের বিরোধিতা করা ও অভিযোগ তোলা। "তোমাদের দৈনন্দিন জীবন চলার পথে কোন বিষয় নিয়ে বিরক্তির উদ্রেক ঘটলে তা নিয়ে মনোমালিন্য কোরো না এবং অন্যকে বিব্রত কোরো না। কিংবা তোমরা কষ্টভোগ করছ বলে তার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোরো না।" এ প্রসঙ্গে ড. ম্যানটন বলেছেন, "তৎকালীন খ্রীষ্টিয়ানরা প্রতিনিয়ত তক্‌ছেদ-করানো ও তক্‌ছেদ-না-করানোর নামে নানা ধরনের উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা সহ্য করতেন, অনেক সময় একে অপরকে কষ্ট দিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি করতেন। ফলে তারা যে শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতনের কারণে নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন তা-ই শুধু নয়, সেই সাথে নিজেদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাঝেও নানা মনোমালিন্য ও বিবাদ হওয়ায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। আমার মতে প্রেরিত যাকোব এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই প্রত্যেক বিশ্বসীকে তাদের বিশ্বাসে স্থির থেকে ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা ধারণ করে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।" সার্বজনীন শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যারা কোন বিষয়ে কষ্টভোগ করতে থাকে, সে সময় তাদের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যেন তারা নিজেদের মধ্যকার কোন বিবাদের কারণে আরও কষ্টের মুখে না পড়ে এবং পাপে পতিত না হয়।

২. লক্ষ্য করুন, কীভাবে এখানে খ্রীষ্টানদের ধৈর্য ধারণ করার জন্য, তাদের অন্তরে সুস্থির করার জন্য এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না তোলার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

(১) কৃষকের দৃষ্টান্ত: আমরা যখন ফসলের ক্ষেতে বীজ বুনি তখন তা গজিয়ে ওঠার বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করি। যখন উপর্যুপরি বৃষ্টি হয় তখন সেই বীজ থেকে চারা গজায় এবং উপযুক্ত সময়ে সেই চারা পূর্ণাঙ্গ ফসলে রূপ নেয় ও আমাদের শ্রমের ফল দান করে। এ কথা ভেবে আমাদের সান্ত্বনা নেওয়া উচিত যে, আমরা যারা স্বর্গীয় রাজ্যের যাত্রা পথে রয়েছি তাদের সামনেও এ ধরনের অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা আসতে পারে, কিন্তু আমাদের সবই ধৈর্যপূর্বক সহ্য করতে হবে। কৃষক যেমন ভাল ফসলের প্রত্যাশা করে, তেমনি আমরাও এখানে একটি গৌরবের মুকুটের প্রত্যাশা করছি। যদি আমাদের তুলনামূলকভাবে একটু বেশি অপেক্ষা করতেই হয়, তথাপি আমাদের উচিত দীর্ঘসহিষ্ণুতা ধারণ করা, কারণ এই ধৈর্যই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল দান করবে।

(২) লক্ষ্য করুন, আমাদের এই অপেক্ষার সময়কাল আসলে কতটা সংক্ষিপ্ত: *প্রভুর আগমন সন্নিকট*, পদ ৮। *দেখ, বিচারকর্তা দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন*, পদ ৯। আমাদের

কোনমতে অধৈর্য হওয়া চলবে না, একে অন্যের সাথে বিবাদ করা চলবে না। মহান বিচারকর্তা সমস্ত ভুলগুলোতে শুধরে দেবেন, যা কিছু ঠিক নেই তা ঠিক করবেন, মন্দদের শাস্তি দেবেন এবং উত্তমদের পুরস্কার দেবেন। সেই সময় কাছে এসে গেছে। তিনি এতই কাছে এসে গেছেন, যেন আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছেন। দুষ্টদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রভুর আগমন খুব কাছে এসে গেছে। ঈশ্বরের লোকদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ন যত বৃদ্ধি পাবে, তত বেশি খ্রীষ্টের আগমনের সময় নিকটবর্তী হবে। সে কারণে বিশ্বাসীদের প্রত্যেকের অন্তর সুস্থির করা প্রয়োজন। বিচারকর্তা খুব কাছে এসে পড়েছেন। তিনি এই পৃথিবীর বিচার করতে আসছেন। এই পত্রটি যখন লেখা হয়েছিল তার চেয়ে প্রায় সতেরোশ বছর এগিয়ে গেছি আমরা। অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমনের মুহূর্তটির দিকে আরও সতেরোশ বছর এগিয়ে এসেছি আমরা। ফলে আমাদের আরও সতর্কতার সাথে প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রয়োজন।

(৩) বিচারকর্তা উপস্থিত হওয়ার পর বিচারে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করে আমাদের উচিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ধার্মিকতায় সচেষ্ট হওয়া: *অভিযোগ তুলো না, যেন তোমাদের বিচার করা না হয়*। অসন্তুষ্টি, অভিযোগ ও মনোমালিন্য আমাদের উপরে ঈশ্বরের বিচার ডেকে নিয়ে আসে। একে অন্যের বিরুদ্ধে বিবাদ, অভিযোগ, অসন্তুষ্টি, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির কারণে আমরা নিজেদের উপরে যতটা পরিমাণে ঈশ্বরের আক্রোশ নামিয়ে আনি, তেমনটা আর অন্য কিছুর কারণে ঘটে না। যদি আমরা আমাদের মধ্যকার মন্দ স্বভাবগুলোকে দূর করতে পারি এবং আমাদের পরীক্ষার সময়গুলোতে ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে আর বিচার দাঁড় করাবেন না। এ কথা ভেবে আমাদের উৎসাহিত হওয়া উচিত।

(৪) ভাববাদীদের দৃষ্টান্তের কথা ভেবে আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত (পদ ১০): *হে ভাইয়েরা, যে ভাববাদীরা প্রভুর সাক্ষাতে কথা বলেছিলেন, তাদেরকে দুঃখভোগের ও ধৈর্য ধারণ করার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ কর*। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, যে ভাববাদীদেরকে ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছেন এবং যাদেরকে সবচেয়ে বেশি আত্মিক অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত হয়েছেন। যখন আমরা দেখি পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিরা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করেছেন, তখন আমাদের এ কথা ভেবে উৎসাহিত হওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের এই কষ্ট ও যন্ত্রণা বৃথা যাবে না। আরও দেখুন, যারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও দুঃখভোগ করেছেন, তারাই সর্বোৎকৃষ্ট ধৈর্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে যাকোব বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলছেন (পদ ১১): *দেখ, যারা স্থির রয়েছে, তাদেরকে আমরা ধন্য বলি*। যত ধার্মিক ও কষ্টভোগকারী মানুষ রয়েছে তারা প্রত্যেকেই সুখী ও ধন্য। যাকোব ১:২-১২ পদ দেখুন।

(৫) ইয়োবকে নিপীড়িতদের উৎসাহ দানের জন্য এক মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। *তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কথা শুনেছ, প্রভুর পরিণামও দেখেছ,* পদ ১১। আইউবের ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের কষ্টে ও যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে দেখি, যা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অসহনীয়। তিনি যখন ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ ভোগ করছিলেন

এমনই এক সময়ে তাঁর জীবনে এই দুঃখ ও কষ্ট নেমে আসে। তথাপি তিনি তাঁর আত্মাকে সুস্থির রেখেছেন, ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং নম্র থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত কে তাঁর কাছে এসেছিলেন? স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরের এই উপস্থিতি ও তাঁর অনুগ্রহ দান আমাদেরকে এ কথা বিশ্বাস করায় যেম প্রভু অত্যন্ত করুণাময় এবং তাঁর দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। আমাদের উপরে যত পার্থিব দুঃখ ও কষ্ট আসুক তা সহ্য করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। যদি আমরা পুরো সময়টা ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে নিঃসন্দেহে তাঁর অপরিসীম দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ দান করবেন। যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধন করে ও তাঁর গৌরব ঘোষণা করে, তাদেরকে পুরস্কার দিতে ঈশ্বর বিলম্ব করেন না। ঈশ্বর এতটাই করুণাশীল যে, তিনি তাঁর লোকদের সমস্ত দুঃখভোগের উপশম করেন ও তাদেরকে আগের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে নিয়ে যান। তাঁর লোকেরা যখন কষ্টভোগ করে তখন তাঁর অন্তর ভেঙ্গে যায়। আমাদের দায়িত্ব পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় ঈশ্বরের পরিচর্যায় নিজেদেরকে নিমগ্ন রাখা এবং ধৈর্যপূর্বক সমস্ত আঘাত ও কষ্ট সহ্য করা, কারণ এই ঝড়ের শেষে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে গৌরবের মুকুট।

যাকোব ৫:১২-২০ পদ

পত্রের শেষের দিকে এসে লেখক অল্প কথায় একাধিক বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। এ কারণে এই পদগুলোতে বিভিন্ন একাধিক প্রসঙ্গের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।

ক. দিব্য করার পাপ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে: *হে আমার ভাইয়েরা, আমি বিশেষভাবে এই কথা বলি, তোমরা দিব্য করো না*, পদ ১২। অনেকে এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে থাকেন এবং এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন: "তোমাদের প্রতি যারা নির্যাতন করে, যারা তোমাদেরকে ভর্ৎসনা করে এবং তোমাদের সম্পর্কে নানা ধরনের বাজে বাজে কথা বলে, তাদের প্রতি দিব্য করো না। তারা তোমাদের প্রতি যে ধরনের আঘাত হানে ও তোমাদেরকে যে ধরনের কষ্ট দিয়ে থাকে, তার জন্য তোমরা তাদের উপর আক্রোশ নিয়ে কোন দিব্য করো না।" নিঃসন্দেহে এখানে এ ধরনের দিব্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়ার কারণে ক্রোধের বশে দিব্য করেছি এমন কথা বললে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা পাপ বলে সাব্যস্ত হবে। তবে প্রেরিত যাকোব এখানে আরও ব্যাপক অর্থে বিষয়টিকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মাঝে অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের পাশাপাশি অপরাধীদের প্রতি দিব্য করার বিষয়টিও রয়েছে। অনেকে দিব্য করার কথাটির অনুবাদ করেছেন *pro panton – সব কিছুর শুরুতে*। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, কোন কিছুর শুরুতে, অর্থাৎ কোন কাজ কর-ার শুরুতে বা কোন আলোচনার শুরুতে বা কোন স্বীকারোক্তির শুরুতে দিব্য করা হয়ে থাকে। প্রথাগত অপ্রয়োজনীয় সমস্ত দিব্য করা নিঃসন্দেহে নিষেধ করা হয়েছে। সেই সাথে যে সকল দিব্য পবিত্র শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে সকল দিব্য করা অত্যন্ত বড় ধরনের

পাপ। অশ্লীলভাবে বা অশ্লীল ভাষায় দিব্য করা যিহূদীদের মধ্যে একটি রেওয়াজ ছিল। যেহেতু এই পত্রটি ছড়িয়ে পড়া বারো বংশের কাছে লেখা হয়েছে, সে কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যারা বিশ্বাসী ছিল না তাদের জন্য এই কথা বলা হচ্ছে। এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য এই দিব্য করা এক মহা কলঙ্ক। প্রেরিত পিতরকে যখন যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হিসেবে প্রকাশ্যে চিহ্নিত করা হল তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন এবং দিব্য করে বা নিজেকে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, তিনি খ্রীষ্টের শিষ্য নন। এর কারণ হচ্ছে, সকলেই খুব ভাল করে জানতেন যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা কখনো যিহূদীদের মত করে দিব্য করেন না। তবে আজও এমন অনেক নামধারী খ্রীষ্টিয় আছেন যাদের অন্যান্য হরেক রকম পাপের পাশাপাশি এই দিব্য করার পাপটি রয়েছে। এই সকল পাপপূর্ণ দিব্য আমাদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অন্তরকে বিচলিত করে। এ প্রসঙ্গে যাকোব বলছেন:-

১. *আমি বিশেষভাবে এই কথা বলি, তোমরা দিব্য করো না*। কিন্তু এমন কত মানুষই না রয়েছে যারা প্রতিনিয়ম নানা বিষয় নিয়ে অযথা দিব্য করে চলেছে এবং নিজেদের পাপের তালিকা বাড়িয়ে চলছে! কিন্তু কেন দিব্য করাকে এখানে বিশেষভাবে বা অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিষেধ করা হচ্ছে?

(১) কারণ এই দিব্য করা সরাসরি ঈশ্বরের মর্যাদায় আঘাত হানে এবং তাঁর নাম ও তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ঘোষণা করে।

(২) কারণ এই পাপটির কোন প্রত্যক্ষ প্রলোভন নেই। কোন কারণ ছাড়াই মানুষ এই দিব্য করার পাপটি করে থাকে। কোন প্রাপ্তির আশায় নয়, কোন সুখের আশায় নয়, কোন সম্মানের আশায় নয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অবচেতনভাবে বিরোধিতা ঘোষণা করে এই পাপটি। *তারা দুষ্টভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে; তোমার শত্রুরা তা অনর্থক গ্রহণ করে*, গীতসংহিতা ১৩৯:২০। মানুষ যতই নিজেকে ধার্মিক বলে ঘোষণা দিক এবং ঈশ্বরকে মনে মনে ভালবাসুক না কেন, ঈশ্বরের নামে অনর্থক দিব্য করার কারণে তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

(৩) মানুষ একবার যখন এই দিব্য করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আর তাদের মধ্যে এ নিয়ে আর কোন জড়তা কাজ করে না। সে কারণে শুরুতেই এই পাপ দমন করা প্রয়োজন।

(৪) আমাদের উচিত বিশেষভাবে কখনোই দিব্য করা উচিত নয়, কারণ আমরা যদি সুখের সময়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ছেলেখেলা করি, তাঁর অমর্যাদা করি, তাহলে কীভাবে আমরা আশা করতে পারি যে, দুর্দশার সময়ে তাঁর নাম ধরে ডাকলে তিনি আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেবেন ও তিনি আমাদের রক্ষাদুর্গ হবেন? এ প্রসঙ্গে মি. ব্যাক্সটার বলেছেন, "আমাদের জীবনের পবিত্রতা ও ধার্মিকতা বজায় রাখার জন্য যে সকল দিব্য করা অপরিহার্য সেগুলোকে এখানে নিষিদ্ধ করা হয় নি। বস্তুত আমাদের উচিত এই সকল অবশ্য পালনীয় দিব্য ও প্রতিজ্ঞাগুলোর মর্যাদা রক্ষা করা।" তিনি আরও বলেছেন যে,

“আমরা আমাদের কথার মধ্য দিয়ে যে দিব্য দিই তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন সুস্পষ্ট বা সুমহান বস্তু বা সত্তার অস্তিত্ব ও সম্মানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করা, যেন এ সম্পর্কে অপরের সন্দেহ বা দ্বিধা দূরীভূত হয়। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে কোন আবেদন রাখা হয় না।” এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্যান্য যে সমস্ত নামে দিব্য করার ব্যাপারে প্রেরিত যাকোব কথা বলছেন সেগুলো আমাদের কথার মধ্য দিয়ে কীভাবে প্রকাশ পায়। যিহূদীরা ভেবেছিল যে, যদি তারা *Chi-Eloah* নামক মহান দিব্যটি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে তাদের আর কোন বিপদ নেই। কিন্তু তারা বিভিন্ন প্রাণীর নাম ধরে এএভাবে দিব্য করা শুরু করেছিল যেন তা ঈশ্বরের সমপর্যায়ের। কাজেই তারা একদিকে যেমন নিকৃষ্ট প্রাণীকে ঈশ্বরের অবস্থানে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে ঈশ্বরের নামকে তারা অত্যন্ত নিচু অবস্থানে নামিয়ে নিয়ে এসে তাঁর অবমাননা করছিল।

২. *বরং তোমাদের হ্যাঁ, যেন হ্যাঁ এবং না যেন না হয়, যেন তোমরা বিচারের দায়ে না পড়*। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা যদি কখনো কোন বিষয় স্বীকার করি তাহলে সব সময়ই যেন আমরা তা স্বীকার করি, সব সময় যেন আমরা সেই বিষয়টির প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। কোনভাবেই যেন আমরা কখনো তা অস্বীকার না করি এবং তাকে মিথ্যা না বলি। যদি আমরা আমাদের দিব্যের বিপরীত কথা কখনো বলি, তাহলে আমরা মিথ্যাচারিতার দায়ে এবং ঈশ্বরের নামকে অবমাননা করার দায়ে বিচারে অভিযুক্ত হব। মানুষ হয় সত্যের পক্ষসমর্থন করার জন্য, নতুবা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দিব্য করে থাকে। আমরা যদি সত্য কথা বলি এবং আমাদের কাজে সৎ থাকি, তাহলে আমাদের আর সেই সত্যের পক্ষে দিব্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের কথার সত্যতাই আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আর এভাবেই আমরা দশ আজ্ঞার তৃতীয়টি আজ্ঞাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সক্ষম হব: *কেননা যে কেউ তাঁর নাম অনর্থক নেয়, সদাপ্রভু তাকে দোষী করবেন*।

খ. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমরা শিক্ষা পেয়েছি যেন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করি (পদ ১৩): *তোমাদের মধ্যে কেউ কি দুঃখভোগ করছে? সে প্রার্থনা করুক। কেউ কি প্রফুল্ল আছে? সে প্রশংসা-গান করুক*। এই পৃথিবীতে একেকজন মানুষ একেক ধরনের অবস্থানে থাকে। আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যেন আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুসারে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করি। সে কারণে আমরা এই পৃথিবীতে কষ্টভোগ করি বা সমৃদ্ধি লাভ করি, অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার জন্য আমাদের আনন্দিত হওয়া প্রয়োজন। কখনো আমাদের মনে দুঃখ থাকে, কখনো অনেক আনন্দ থাকে। ঈশ্বর আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকেন যেন আমরা প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় পরিস্থিতিতেই তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হিসেবে পরিগণিত হতে পারি। কষ্টভোগের সময় আমাদের উচিত প্রার্থনা করা এবং সমৃদ্ধির সময় উচিত প্রশংসা করা। এমন নয় যে শুধুমাত্র দুঃখ-কষ্টে বা সমস্যায় জর্জরিত হলেই আমরা প্রার্থনা করবো, কিংবা শুধুমাত্র আনন্দের সময় প্রশংসা-গান গাইব। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমাদের দায়িত্ব হিসেবে এগুলো পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

১. নিপীড়ন ও কষ্টভোগের দিনে প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই ততটা যথোপযুক্ত নয়। একজন ব্যক্তি যখন কষ্টের মধ্যে থাকে তখন তার নিজের তো প্রার্থনা করতেই হবে, সেই সাথে অন্যদেরও উচিত তার জন্য প্রার্থনায় একত্রিত হওয়া। কষ্টভোগের সময়ের অপর নাম প্রার্থনার সময়। এই উদ্দেশ্যেই অনেক সময় ঈশ্বর আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট পাঠান যেন আমরা তাঁকে স্মরণ করি এবং যারা এতদিন তাঁকে অবহেলা করে এসেছে, তাঁকে সময় দেয় নি তারা যেন তাঁর প্রতি মনোযোগী হয় ও তাঁর দিকে মন ফিরায়। দুঃখ-কষ্টের সময় আত্মা নম্র থাকে ও অন্তর থাকে ভগ্ন-চূর্ণ। নম্রতায় পূর্ণ অন্তর থেকে যে প্রার্থনা আসে তা ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। দুঃখ-কষ্টে পড়লে আমরা সাধারণত অভিযোগ করি। ঈশ্বর ছাড়া এমন আর কে আছে যার কাছে আমরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের অভিযোগ প্রকাশ করব? যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের সময় বিশ্বাস ও প্রত্যাশা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা জরুরি। আমাদের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ধারণ ও বৃদ্ধি লাভের জন্য প্রার্থনা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। *তোমাদের মধ্যে কেউ কি দুঃখভোগ করছে? সে প্রার্থনা করুক।*

২. আনন্দময় ও সমৃদ্ধিপূর্ণ সময়ে প্রশংসা-গান গাওয়া খুবই যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী। মূল ভাষায় বলা হয়েছে *psalleto* গাওয়া, এর সাথে গীতসংহিতা বা অন্য কোন শব্দ যুক্ত করা হয় নি। প্রথম খ্রীষ্টিয় যুগের বিভিন্ন রচনা পড়ে, বিশেষ করে প্লিনির একটি পত্র এবং জাস্টিন মার্টায়ার ও টার্টুলিয়ানের কিছু রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে সময়কার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা প্রায়শই প্রশংসা গীত গাইতেন। এগুলোর মধ্যে ছিল পবিত্র শাস্ত্রের উদ্ধৃত বাণী থেকে তৈরি গীত-গান এবং বিভিন্ন গীতিকারের ব্যক্তিগত সৃষ্টি। যদিও অনেকে ভেবে থাকেন যে, পৌল কলসীয় ও ইফিষীয়দেরকে একে অপরের সাথে শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্র থেকে *psalmois kai hymnois kai odais pneumatikais* – গীতসংহিতা ও প্রশংসা-গানের মধ্য দিয়ে কথা বলতে বলেছেন, রাজা দায়ূদের গীতগুলোকে হিব্রু ভাষায় শূরীম (*Shurim*), তেহিলিম (*Tehillim*) ও মিজোরিম (*Mizmorim*) শব্দের মধ্য দিয়ে পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা প্রেরিত যাকোব মূলত এখানে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। তবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, গীতসংহিতার গীত-গানগুলো গাওয়ার জন্য সুসমাচারে আমাদেরকে বিশেষ নির্দেশনা দান করা হয়েছে এবং ঈশ্বরতে পবিত্র আনন্দই আমাদের প্রকৃত আনন্দ। যে ব্যক্তি আনন্দে ও সমৃদ্ধিতে জীবন ধারণ করবে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আনন্দের সাথে প্রশংসা গীত গাইতে হবে, যেভাবে দায়ূদ তাঁর গীতসংহিতায় গেয়েছেন। পরিবারে, কাজের ক্ষেত্রে, সামাজিক জীবনে তথা সকল ক্ষেত্রে এই পবিত্র আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে হবে। আমাদের এই আনন্দের গান এমন হোক যেন তা আমাদের হৃদয়ের সুর ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয় এবং আমাদের এই ভক্তিপূর্ণ প্রশংসায় যেন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

গ. অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত লোকদের বিষয়ে আমাদেরকে এখানে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং সুস্থতা দানের মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা প্রদানের বিশেষ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ থাকে তাহলে তার যা যা করতে হবে তা হচ্ছে:-

১. মণ্ডলীর প্রাচীন নেতাদেরকে আহ্বান করা; *presbyterous tes ekklesias* – মণ্ডলীর পালক, পুরোহিত বা পরিচর্যাকারী, পদ ১৪,১৫। যে ব্যক্তি অসুস্থ হবেন তার দায়িত্ব হচ্ছে মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদেরকে আহ্বান জানানো যেন তারা তার কাছে আসেন এবং তাকে সহযোগিতা করেন ও তার জন্য প্রার্থনা করেন।

২. অসুস্থ ব্যক্তি যখন আহ্বান জানাবেন তখন তার কাছে গিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করা মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের দায়িত্ব। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা দেখে ও বুঝে তার জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন, যেন তাদের প্রার্থনা কার্যকরী ও উপযুক্ত হয়।

৩. অলৌকিকভাবে সুস্থতা লাভের প্রার্থনা করার জন্য *প্রভুর নামে তাকে তৈলাভিষিক্ত করে তার উপরে প্রার্থনা* করা প্রয়োজন। অনেক ব্যাখ্যাকারীই মনে করেন এই অভিষেকের তেল আসলে অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন কোন তেল যার অলৌকিক কাজ সাধনের ক্ষমতা আছে। তাই যখন অলৌকিক কাজ সাধনের ক্ষমতা আর পরিচর্যাকারীদেরকে দেওয়া হল না তখন তেল দিয়ে অভিষেক করার এই রীতিও বন্ধ হয়ে গেল। মার্ক লিখিত সুসমাচারে আমরা দেখি প্রেরিতরা বহু অসুস্থ মানুষকে তেল দিয়ে অভিষেক করেছিলেন ও তাদেরকে সুস্থ করেছিলেন, মার্ক ৬:১৩। খ্রীষ্টের সময়ের প্রায় দু'শো বছর পরও মণ্ডলীতে এই রীতি প্রচলিত ছিল। তবে পরবর্তীতে সুস্থতা প্রদানের বিশেষ দানটি এর সাথে যুক্ত হয়েছিল এবং যখন এই আশ্চর্য দানটি পরিচর্যাকারীদের মধ্যে আর দেখা গেল না, তখন এই রীতিটিও বন্ধ করে দেওয়া হল। পোপতন্ত্রে এখনও তেল দ্বারা অভিষেক করার রীতিটি কিছুটা ভিন্নভাবে প্রচলিত রয়েছে। প্রেরিতরা রোগ থেকে সুস্থ করার জন্য তেল দ্বারা অভিষেক করতেন, আর পোপতন্ত্রে পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য এবং আত্মাকে দৃশ্যমান বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য তেল দিয়ে অভিষেক করা হয়ে থাকে। তবে খ্রীষ্ট যে কারণে এই রীতিটির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন তার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এই রীতির মধ্য দিয়ে তারা অদৃশ্য অনুগ্রহের বদলে দৃশ্যমান অনুগ্রহ লাভের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে বিবৃত উদ্দেশ্য অনুসারে কোন রীতি অনুসরণ না করে তা বিপরীতভাবে পালন করার বদলে তা একেবারে পালন না করাই শ্রেয়। অনেক প্রোটেস্ট্যান্টরা ভেবে থাকেন যে, তেল দিয়ে অভিষেক করার এই রীতিটি খ্রীষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেন নি। কিন্তু যাকোবের এই পত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সুস্থতা লাভের জন্য যেখানে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সেখানে এই তৈলাভিষিক্ত করার প্রসঙ্গ চলে আসে। কোন কোন প্রোটেস্ট্যান্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈলাভিষিক্ত করার পক্ষে কথা বলে থাকেন। সাধারণভাবে যে কোন ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে তেল দিয়ে অভিষেক করা যেত না, এমনকি প্রৈরিতিক যুগেও নয়। অনেকের মতে কোন যুগেই এই রীতিটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা উচিত নয়। বরং যে সমস্ত ক্ষেত্রে অভিষেকের যোগ্য কোন ব্যক্তির মাঝে অপরিমেয় বিশ্বাসের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় এবং যার বিশেষ অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে সুস্থতা লাভের জন্য, সেক্ষেত্রে এই রীতি প্রয়োগ করা গ্রহণযোগ্য। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে একটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, অসুস্থদেরকে তেল দ্বারা অভিষেক করার কথাই শুধু বলা হয় নি, তাদের জন্য প্রার্থনা করার

কথা বলা হয়েছে: *তাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে*, পদ ১৫।

৪. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যে প্রার্থনা করা হবে তা অবশ্যই অকৃত্রিম বিশ্বাস থেকে করতে হবে। যে ব্যক্তি প্রার্থনা করছেন এবং যার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাস থাকতে হবে। অসুস্থতার সময়ে কোন শিথিল বা গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় কাজ হবে না। সেই প্রার্থনা হতে হবে বিশ্বাসসিদ্ধ প্রার্থনা।

৫. আমরা এখানে প্রার্থনার সাফল্য লক্ষ্য করতে পারি। প্রভু তাকে উঠাবেন; অর্থাৎ যদি সেই ব্যক্তিটি উদ্ধার পাওয়ার মত উপযুক্ত বা যোগ্য হয়, তাহলে প্রভু তাকে পরিত্রাণ করবেন। সে যদি পাপ করে থাকে তবে তা মাফ করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যখন কোন পাপ করে অনেক সময় তার পাপের শাস্তি হিসেবে তাকে রোগাক্রান্ত হতে হয়। তাই যখন তার পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তখন তার সমস্ত অসুস্থতা ও রোগ তুলে নেওয়া হবে। একারণেই খ্রীষ্ট সেই পঙ্গু লোকটিকে বলেছিলেন, *যাও, আর পাপ কোরো না*। কারণ লোকটি তার পাপের কারণে অসুস্থ হয়েছিল। এ কারণে আমাদের নিজেদের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে জিনিসটি চাইতে পারি তা হচ্ছে, তিনি যেন আমাদেরকে ও অন্য সকলকে অসুস্থতার সময় আমাদের পাপ মাফ করেন। পাপ আমাদের অসুস্থতার মূল এবং আমাদের দেহের কাঁটা। যদি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা অনুগ্রহ লাভ করবো এবং আমাদের দৈহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব। পাপের ক্ষমা লাভের উপরে যখন সুস্থতা লাভের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখন আমরা হিষ্কিয়ের মত করে বলতে পারি: তুমি আমার আত্মাকে ভালবেসে আমাকে পাপের গর্ত থেকে টেনে তুলেছ, যিশাইয় ৩৮:১৭। যখন আমরা অসুস্থ ও বেদনাগ্রস্ত থাকি, তখন অধিকাংশ সময় আমরা ক্রন্দন করে এই প্রার্থনা করি, আমাকে শান্তি দাও! আমার যন্ত্রণা দূর কর! কিন্তু আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত: হে ঈশ্বর, আমার পাপ ক্ষমা কর!

ঘ. খ্রীষ্টানদেরকে এক জন অন্য জনের কাছে গিয়ে নিজ নিজ পাপ স্বীকার করা এবং এক জন অন্য জনের জন্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পদ ১৬। অনেক ব্যাখ্যাকারী এই পদটিকে ১৪ পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। যখন অসুস্থ লোকেরা পরিচর্যাকারীদেরকে তাদের কাছে এসে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করেন তখন অবশ্যই তাদের ভুল ও পাপগুলো পরিচর্যাকারীদের কাছে স্বীকার করতে হবে। যখন কেউ এ ব্যাপারে সচেতন থাকে যে, তার কোন বিশেষ পাপের কারণে তাকে অসুস্থতার মধ্য দিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তখন সেই পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রার্থনা না করলে সেই অসুস্থতা কখনোই দূর হবে না। যারা তার জন্য প্রার্থনা করবেন তারা যদি তার অসুস্থতার কারণ না জানেন তাহলে তাদের প্রার্থনা তার জন্য কোন উপকার বয়ে নিয়ে আসতে পারবে না। যখন মানুষ একে অন্যের বিরুদ্ধে পাপ করে তখন তাদের অবশ্যই পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। সেভাবে একজন মানুষ যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে তখন তার উচিত ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করা ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া, যেন ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা তার জন্য প্রার্থনা করেন এবং তার সমস্ত পাপ মাফ করে তাকে ঈশ্বর সুস্থ করেন। মানুষের এই

পৃথিবীতে কোন পাপ করা হলে তা মানুষের কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া পাপীর কর্তব্য। অনেক সময় কোন বিশেষ পরিচর্যাকারী বা প্রার্থনাকারী বন্ধুর কাছে আমাদের পাপগুলোর কথা স্বীকার করা প্রয়োজন, যেন সেই বন্ধু আমাদের পাপগুলোর জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুশোচনাপূর্বক প্রার্থনা করতে পারেন এবং ঈশ্বরের করুণা ও দয়া যাচঞা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে আমাদের এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, যাকোব আমাদের পাপগুলো সব মানুষের কাছে বলে বেড়াতে বলছেন। আমরা এমন মানুষের কাছে আমাদের পাপগুলোকে প্রকাশ করবো যারা আমাদের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে পাপের ক্ষমা লাভের প্রার্থনা করতে পারবেন। এভাবে আমাদেরও নিজেদেরকে এভাবে প্রকাশ করতে হবে যেন আমরা অন্যদের পাপের স্বীকারোক্তি শোনার ও তার জন্য প্রার্থনা করার মত যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারি। ১৩ পদে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য নিজের প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে: তোমাদের মধ্যে কেউ কি দুঃখভোগ করছে? সে প্রার্থনা করুক। অপরদিকে ১৪ পদে প্রার্থনা করার জন্য প্রার্থনা করার জন্য পরিচর্যাকারীদেরকে আহ্বান জানানোর বিষয়ে বলা হয়েছে। সবশেষে ১৬ পদে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় বিশ্বসীকে একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে; যেন পরিচর্যামূলক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রত্যেক প্রকার প্রার্থনায় খ্রীষ্টিয়ানরা পরস্পরের শরিক হয়।

ঙ. প্রার্থনার মহা সুফল ও কার্যকারিতা এখানে প্রমাণ করা হয়েছে: *ধার্মিকের প্রার্থনা মহা শক্তিযুক্ত এবং কার্যকরী*। ধার্মিক ব্যক্তি তার নিজের জন্য প্রার্থনা করুন বা অপরের জন্য, তা সব সময়ই শক্তিশালী হয়ে থাকে: ভাববাদী এলিয়ের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন, পদ ১৭,১৮। যিনি প্রার্থনা করেন তিনি অবশ্যই একজন পবিত্র ব্যক্তি। কোন মানুষই শতভাগ নিষ্কলুষ ও পবিত্র হতে পারে না; কিন্তু এখানে ধার্মিক ব্যক্তি বলতে বোঝানো হয়ে তাদেরকে, যারা সজ্ঞানে কখনো মন্দতা বা কলুষতার পক্ষাবলম্বন করেন না। সেই ধার্মিক ব্যক্তি যে প্রার্থনা করবেন সেই প্রার্থনাও হতে হবে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থনা। অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত অন্তর থেকে উৎসারিত হবে সেই প্রার্থনা এবং তা রচিত হবে অটল বিশ্বাস দ্বারা। আমাদের অবশ্যই উচিত এমন বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করা যার জন্য আমরা এ ধরনের প্রার্থনা করতে পারি। তাতে আমাদের বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলে পর আমরা নিশ্চয়তা লাভ করব যে, ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শ্রবণ করেছেন এবং যার জন্য প্রার্থনা করা হল তাকে তিনি যথাযোগ্য ফল দান করবেন। ভাববাদী এলিয়ের সাফল্যের কথা বিবৃত করে এখানে প্রার্থনার শক্তি প্রমাণ করা হয়েছে। সাধারণ যে কোন ক্ষেত্রেও বিষয়টি আমাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে, যদি আমরা বিবেচনা করি যে, ভাববাদী এলিয় আমাদেরই মত *সুখ-দুঃখভোগী মানুষ ছিলেন*। তিনি ছিলেন একজন উত্তম ও মহান ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর মধ্যেও ছিল ভুল-ভ্রান্তি। অন্য সব মানুষের মতই তাঁরও জীবন ছিল হাসি-কান্নায় মেশানো। আমাদের উচিত প্রার্থনার সময় মানুষের দোষ-গুণের দিকে লক্ষ্য না করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করা। কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের দিক থেকে ভাববাদী এলিয়কে আমাদের অনুসরণ করা উচিত যে, তিনি একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করতেন, যেভাবে বলা হয়েছে, *তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করলেন*। শুধুমাত্র মুখ দিয়ে প্রার্থনার কথাগুলো উচ্চারণ করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু সেই সাথে আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে ও ভক্তি সহকারে

প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের চিন্তা স্থির হতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও অটল হতে হবে। পাশাপাশি সমস্ত কিছুতেই থাকতে হবে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপরিমেয় অনুগ্রহের ছোঁয়া। এভাবে যখন আমরা প্রার্থনা করব, তখন আমাদের প্রার্থনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। এলিয় প্রার্থনা করেছিলেন *যেন বৃষ্টি না হয়*। ঈশ্বর তাঁর এই প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং এক অত্যাচারী পৌত্তলিক সম্রাটের বিরুদ্ধে এলিয়ের এই অবস্থানকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সে কারণে *তিন বছর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হয় নি*। একইভাবে *পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন; আর আসমান থেকে বৃষ্টি পড়লো*। এতে করে আমরা দেখতে পাই যে, প্রার্থনা সেই চাবি যা দিয়ে স্বর্গ উন্মুক্ত করা যায় আবার অবরুদ্ধও করা যায়। এই প্রেক্ষাপটের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে প্রকা ১১:৬ আয়াতের। সেখানে দুজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে যাদের স্বর্গ রুদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে, যেন কোন বৃষ্টি না হয়। প্রার্থনার এই অসাধারণ কার্যকারিতা ও ক্ষমতার দৃষ্টান্ত পবিত্র শাস্ত্রে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্ত মানুষ দৃঢ় ও আন্তরিক প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহ বোধ করেন। ঈশ্বর কখনো যাকোবের বংশের কোন লোককে এ কথা বলেন নি যে, *তোমরা বৃথাই আমার মুখ দর্শন কর*। যদি এলিয় তাঁর প্রার্থনা দিয়ে মহান ও আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, তাহলে কোন ধার্মিক মানুষের প্রার্থনাই বিফলে যাবে না। আমাদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে ঈশ্বর যেমন অলৌকিক কাজ সাধন করেন, সেভাবে আমাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহও দান করেন।

চ. এই পত্রটি শেষ করা হয়েছে এই বিশেষ আবেদন রেখে, যেন আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে অন্যদের পরিত্রাণ সাধনের চেষ্টা করি, পদ ১৯,২০। অনেকে এই পদগুলোকে যাকোবের নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবে মনে করে থাকেন; কারণ তিনি যিহূদী খ্রীষ্টানদেরকে তাদের নানা ভুল-ত্রুটির জন্য এই পত্রে তীক্ষ্ণভাবে অভিযোগ করেছেন। তাদেরকে এই ভুল-ত্রুটি থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য তিনি কেন এতটা চিন্তাযুক্ত সে ব্যাপারে তিনি জোরদার যুক্তি উত্থাপন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের পাপ মোচন করতে চেয়েছেন এবং তাদের আত্মার পরিত্রাণ লাভের পথ সুগম করতে চেয়েছেন। তবে আমাদের অবশ্যই অন্যদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে। প্রেরিত যাকোব নিজে ধার্মিক ও অন্তরে শুদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন বলেই যিহূদী খ্রীষ্টানদের ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে তাদের সংশোধন করার জন্য সাহস ও কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। বলা হয়েছে, “যদি কেউ ভুল করে এবং কেউ তাকে সংশোধন করতে চায়, তাহলে সেই সংশোধনকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই নির্দোষ ও ত্রুটিহীন হতে হবে। তাতে করে সে একটি আত্মাকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করারর মত যোগ্য বলে প্রতীয়মান হবে।” ভাই বলে সম্বোধন করে যাদেরকে যাকোব এখানে ভ্রান্তি থেকে সংশোধন করতে চাচ্ছেন, তাদের মত তিনিও ভুল-ভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। একজন মানুষের অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র থাকার কারণে তার কখনোই গর্ব বা অহঙ্কার করা উচিত নয়। আবার তিনি যদি কখনো কোন ভুল নিজের অজান্তেও করে থাকেন, তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তার কখনো অনিচ্ছুক হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ কোন ভুল করে থাকেন, তিনি যতই মহান বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হোন না কেন, তার ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে আমাদের

মোটেও ভয় পাওয়া উচিত নয়। আবার মানুষ যতই দুর্বল ও ক্ষুদ্র হোক না কেন তার জ্ঞান ও বোধগম্যতা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসা থেকে আমাদের কখনোই বিরত থাকা উচিত নয়। আমাদের জন্য যা মহান বিধান এবং সত্যের আদর্শ, সেই সুসমাচারের বিরোধী কোন কাজ বা মত পোষণ যদি কেউ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব হবে তাকে সংশোধন করে আবারও তাকে সুসমাচারের কাছে নিয়ে আসা ও সুসমাচারের আদর্শ অনুসারে জীবন চালাতে তাকে উৎসাহিত করা। মানুষের জীবন ও বিচারবুদ্ধিতে সাধারণত একই সাথে ভ্রান্তি দেখা দেয়। জীবনের প্রতিটি ভুল কাজের পেছনেই রয়েছে কোন না কোন মতবাদগত ভ্রান্তি। কেউই স্বভাবগত দিক থেকে মন্দ নয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ভুল নীতি জীবনে অনুসরণ করে থাকে। তাদেরকে সংশোধন করতে হলে তাদের মধ্য থেকে এই ভ্রান্তিগুলো দূর করতে হবে এবং তারা যে মন্দতার প্ররোচণায় চালিত হচ্ছে সেগুলোকে সনাক্ত করে তাদের জীবন থেকে দূর করে দিতে হবে। আমাদের কোন ভাই যদি কোন ভুল করে থাকে তাহলে আমরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত করে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলতে পারি না এবং থাকে শাস্তি দিতে পারি না। একজন মানুষের কোন ভুল হলে তাকে আমরা তাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারি না। বরং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সংশোধন করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা এবং সে সংশোধিত হলে পর তার জীবনে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে তা জানিয়ে তাকে উৎসাহিত করা। এতে করে তারা সান্ত্বনা পাবে এবং তাদের ভুলগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। পরিশেষে তারা ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়ে জীবন মুকুট লাভ করবে। যে ব্যক্তি *সত্য থেকে দূরে সরে যায়* (পদ ১৯) সেই ব্যক্তিকে তার *ভ্রান্ত-পথ থেকে ফিরিয়ে আনা* প্রয়োজন, পদ ২০। একজন মানুষের মতাদর্শ জোর করে পরিবর্তন করলেই তাকে সংশোধন করা যায় না। তার জীবনাচরণ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। একজন পাপীদেরকে সংশোধন করতে হলে তার জীবনের সমস্ত ভুলগুলোকে ঠিক করতে হবে; তাকে এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে নিয়ে আসলে বা তার চিন্তা পরিবর্তন করে নতুন চিন্তা ঢোকালে চলবে না। যে ব্যক্তি এভাবে একজন পা যীশুর ব্যক্তিকে তার জীবন চলার পথ সম্পর্কে শিক্ষা দেয় সে একটি আত্মাকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে। প্রতি মানুষের মাঝে একটি করে আত্মা রয়েছে। আমরা যখন সেই মানুষটির পরিত্রাণ লাভের পথ সুগম করার জন্য একটি পদক্ষেপ নিই, তখন তার আত্মা স্বর্গের দিকে একটি পদক্ষেপ এগিয়ে যায়। আত্মা একজন মানুষের সবচেয়ে প্রধান অংশ হওয়ায় শুধুমাত্র আত্মার পরিত্রাণ লাভের কথা এখানে বলা হচ্ছে। বস্তুত একজন মানুষকে সংশোধন করা হলে তা পুরো সত্তাই জীবন লাভ করে। তার আত্মা নরক থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তার দেহ কবর থেকে পুনরুত্থিত হয় ও চিরন্তন মৃত্যু থেকে রেহাই পেয়ে অনন্ত জীবন লাভ করে। তখন অন্তর ও জীবনের এ ধরনের পরিবর্তনের কারণে তার অনেক পাপ ঢেকে যায়। আয়াতের এই অংশটি পবিত্র শাস্ত্রের অন্যতম একটি সান্ত্বনাদায়ক অংশ। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে, আমাদের অনেক পাপ থাকলেও, এমনকি অগণিত হলেও তা ক্ষমার যোগ্য। যখন আমাদের পাপগুলো মোচন হয়ে যায়, তখন আর সেগুলো আমাদের বিরুদ্ধে গণ্য করা হয় না এবং তা আর আমাদের বিরুদ্ধে বিচারে ধার্য করা হয় না। মানুষের এই কথা ভেবে উৎসাহিত হওয়া উচিত যে,

তাদের নিজ নিজ পাপ ঢেকে দেওয়ার বা মোচন করার সুযোগ তাদের হাতেই রয়েছে। পাপ মোচনের জন্য এর চেয়ে কার্যকর কোন উপায় আর নেই। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, জীবন চলার পথের ভুলগুলোকে সংশোধন করে নেওয়ার কারণে বহু মানুষের পূর্ব জীবনের পাপ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে এবং তাদের কারণে অন্যান্যরাও নিজেদের ভুলগুলোকে সংশোধন করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত হয়েছে। সর্বোপরি আমরা বুঝতে পারি যে, পাপীদের মন পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত। এতে করে পৃথিবীতে মানুষের মাঝে অশান্তি ও পাপ প্রবণতা হ্রাস পাবে, পৃথিবীতে মন্দতার রাজত্ব ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হবে। আমাদের এই কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ পাবে। শেষ বিচারের দিনে আমাদের এই ধার্মিকতার কাজ আমাদেরকে সান্ত্বনা যোগাবে এবং আমাদের সম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যারা মানুষকে ধার্মিকতার পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মহিমা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে।